পাতালের ঐশ্বর্য

সংকর্ষণ রায়



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

পাতালের ঐশ্বর্য

সঙ্কর্ষণ রায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

PATALER AISWARYA

(Under ground Wealth)

SANKARSAN ROY

প্রকাশকাল : অকটোবর, ১৯৮৪

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা–৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
দুর্গাপ্রসাদ মিত্র
এলম্ প্রেস
৬৩, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০ ০০৬

চিত্রাঙ্কণ : দেব প্রসাদ দেব

প্রচ্ছদ : বিমল দাস,

মূল্য : দশটাকা

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

ভূমিকা

পাতালের ঐশ্বর্য মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন খনিজ সম্ভার। খনিজ থেকে মানুষ পেয়েছে ধাতু, নিত্যব্যবহার্য সব বস্তু, মণি-মানিক্য প্রভৃতি। মানুষের ধন-সম্পদের উৎস হ'ল খনিজ, অধিকাংশ শিল্প-বাণিজ্য গ'ড়ে উঠেছে খনিজকে ভিত্তি ক'রে। মানব সভ্যতাকে যদি একটা বড় সৌধ ব'লে ধরা হয়, তার নির্মাণের উপকরণ হল খনিজ—মানব সভ্যতার পর্যায়গুলি খনিজ বা খনিজ থেকে নিষ্কাশিত ধাতু দিয়ে চিহ্নিত। সভ্যতার উষালগ্ন হল প্রস্তর-যুগ, প্রস্তর যুগের পর এল ধাতুযুগ।

খনিজ মানুষের অস্তিত্বে নিঃশ্বাসের বায়ুর মতই অপরিহার্য, অতএব খনিজ সম্পর্কে মানুষের আগ্রহের অন্ত নেই। মাটি ও পাথরের আড়ালে প্রচ্ছন্ন খনিজ খুঁজে বের করা গুপ্তধন খুঁজে বের করার মতই রোমাঞ্চকর। এই রোমাঞ্চকর কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি আমি বিগত তিন দশক যাবৎ। খনিজ খোঁজার সূত্রে যে সব তথ্য আহরণ করেছি তাদের সম্বন্ধে সর্বসাধারণের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই ঐ সব তথ্য ও তত্ত্ব রম্য প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরছি। আমার বিশ্বাস আবার এই সব রচনা প'ড়ে পাঠক-পাঠিকারা ভূতাত্ত্বিকদের মতই খনিজ খোঁজার ব্যাপারে অণুপ্রাণিত হবেন।

লেখক

সূচীপত্র

॥ ১ ॥

পাতালের আলো

স্কুলে ইতিহাসের ক্লাসে একদিন আমাদের ইতিহাসের মাষ্টারমশাই বলেছিলেন, আকাশের আলোয় আমাদের দেহ-মনের বিকাশ, কিন্তু মানুষের সভ্যতার বিকাশ পাতালের আলোয়।

পাতালকে আমরা অন্ধকার বলেই জানতাম। কাজেই পাতালের আলো হেঁয়ালির মত লাগল আমাদের কাছে। পাতাল থেকে আলোকপাত কী করে সম্ভব ভাবতে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি।

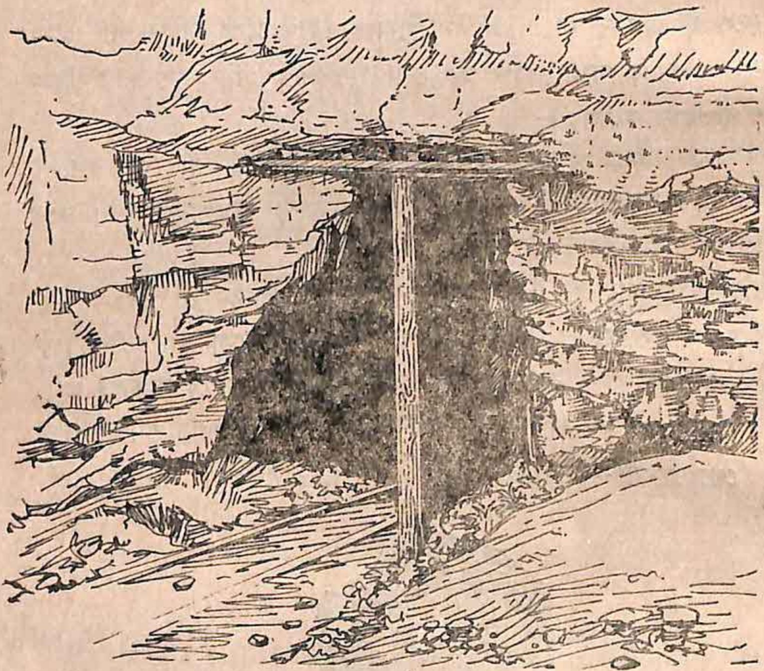
মাষ্টারমশাই আমাদের মুখের ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর কথায় আমাদের ধাঁধা লেগেছে। তিনি বললেন, পাতালের আলো হল মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন খনিজ পদার্থ। খনিজ থেকে মানুষ হাতিয়ার পেয়েছে, যে হাতিয়ার তার হাতকে করেছে শক্তিশালী। পেয়েছে সোনা, তামা, রাং, লোহা, সীসা প্রভৃতি ধাতু। পেয়েছে মণি-মাণিক্য, রাঙাবার রং, প্রসাধনের সামগ্রী। খনিজ দিয়েই



কেলাসিত গন্ধক যুক্ত পাইরাইট

মানুষের শিল্প-বাণিজ্য, ধন-দৌলত। সভ্যতাকে যদি একটা বড় সৌধ বলে ধরা হয়, তার নির্মাণের উপকরণ হল খনিজ। মানবসভ্যতার পর্যায়গুলি খনিজ বা খনিজ থেকে নিষ্কাশিত ধাতু দিয়ে চিহ্নিত। সভ্যতার সূত্রপাত পাথর দিয়ে। বাইবেলের বুক অফ দানিয়েলস-এ অবশ্য সভ্যতার উষালগ্নকে মৃত্তিকা-লগ্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মাটি ও পাথরের পর মানবসভ্যতায় এল ধাতুযুগ। তামা, ব্রোঞ্জ ও

লোহা এই তিনটি ধাতু দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে মানবসভ্যতার তিনটি যুগ। সবার শেষে লোহার যুগ। সে যুগ এখনো চলছে। ধাতুযুগের গোড়া থেকেই সোনাকে চিনেছে মানুষ। মানুষের সভ্যতা প্রায় আগাগোড়াই স্বর্ণমণ্ডিত। সেই হিসেবে তিনটি ধাতুযুগকে এক স্বর্ণযুগ দিয়ে মেলানো যায়। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে মাটির নীচের খনিজ সম্পদ আঁধারের আধারে লালিত আলোর মত। বাইরে এসে মানুষের সভ্যতাকে তা আলোয় আলোকময় করেছে।



পাতালপুরীর প্রবেশপথ

মাষ্টারমশাইয়ের কথাগুলো পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও খনিজ সম্বন্ধে কৌতূহল বোধ করেছি। বড় হয়ে খনিজের সন্ধানে দুর্গম গিরি-কান্তার-মরু পেরিয়ে, গহন অরণ্যে পরিক্রমা করে অনুভব করেছি যে খনিজ খোঁজার মধ্যে একটা নেশা আছে! এ নেশার যেন শেষ নেই, হামেশা মনকে তা উত্তেজিত করে। এই নেশার প্রেরণায় অনেক সন্ধানী দুর্গম থেকে দুর্গমতর পথ অতিক্রম করেছেন। আমেরিকার স্বর্ণসন্ধানীদের গোল্ড রাশ-এর পেছনেও এই নেশা সক্রিয়।

খনিজকে ইংরেজীতে বলে মিন্‌রল্‌ (mineral)। মাইন্‌ শব্দ থেকে মিন্‌রল্‌ শব্দটি এসেছে। ইংরেজীর অনুকরণে খনিজ শব্দটিও খনি থেকে জাত। অবশ্য সাধারণভাবে প্রকৃতিজাত অজৈব বস্তুমাত্রকেই খনিজ বা মিন্‌রল্‌ বলা হয়—যেমন পাথর, লোহা, তামা, সোনা, রূপা ইত্যাদি। যে বস্তু মূলতঃ প্রাণিদেহ বা উদ্ভিদ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু কোটি কোটি বছর ধরে পলিমাটির স্তরের নীচে চাপা পড়ে থেকে পাথরে জমাট বেঁধেছে, তাকেও খনিজ বলে মেনে নেওয়া হয়। যেমন চুনা-পাথর, পাথুরে কয়লা বা পেট্রোলিয়াম। জলজ প্রাণীর কঙ্কাল জমে জমাট বেঁধে চুনাপাথরের উৎপত্তি। কয়লা ও পেট্রোলিয়াম যথাক্রমে উদ্ভিদ ও সামুদ্রিক প্রাণীর অবশেষ। মিন্‌রল্‌ শব্দের বিশেষ একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাও আছে। প্রকৃতির বুকে যে বস্তু নির্দিষ্ট গঠন ও রাসায়নিক উপাদান নিয়ে গঠিত তাকে বলা হয় মিন্‌রল্‌। বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী পরিভাষাকাররা মিন্‌রল্‌কে 'মণিক' বলে অভিহিত করেছেন। মণি-মাণিক্যের সঙ্গে মণিকের ভ্রম হতে পারে, তাই খনিজ শব্দটিই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

খনিজকে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞানুযায়ী চিনে নিতে অনেক সময় লেগেছে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আগে খনিজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চেনার চেষ্টা হয়নি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই খনিজ মানুষের ব্যবহারে এসেছে। সভ্যতার প্রথম প্রহরেই মানুষ সোনা আবিষ্কার করেছে, আবিষ্কার করেছে বিবিধ রত্ন। ক্রমে ক্রমে তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা, রূপা, সীসা ইত্যাদি ধাতুযুক্ত খনিজ আয়ত্তে এসেছে প্রাগিতিহাসের মানুষের। মানুষ ইতিহাসের সীমার মধ্যে আসার আগেই অসংখ্য খনিজকে নিজের কাজে লাগিয়েছে।

খনিজ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল কবে থেকে হল তা নির্ণয় করা বিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকদের অসাধ্য। প্রত্নতাত্ত্বিকরা শুধু এইটুকু বলতে পারেন যে মানুষ যখন থেকে নিজের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, তখন থেকেই খনিজ পদার্থ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতির বুকে প্রচ্ছন্ন স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধানে নব্য প্রস্তরযুগের মানুষদের তৎপরতার প্রমাণ আছে।

ধাতু আবিষ্কারের বহু পূর্ব থেকে মানুষ খনিজের খোঁজে প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে বিচরণ করে আসছে। হাজার হাজার বছর ধরে চলছে এই সন্ধানপর্ব—আজও তার শেষ হয়নি।

খনিজের প্রতি প্রাচীন দার্শনিকদেরও দৃষ্টি পড়েছিল। খনিজের স্বরূপ নির্ণয়ের

চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। প্রায় তিন হাজার বছর আগে ভারত ও চীনের দার্শনিকরা ধাতু সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। তারপর পারস্য ও গ্রীসের পণ্ডিতরা ধাতুসচেতন হলেন। গ্রীসের দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক) বলে-ছিলেন যে সব ধাতুরই উৎপত্তি পারদ ও গন্ধকের সংযোগে ঘটেছে। প্লেটোর মতে মাটি, বাতাস, আগুন ও জল থেকে পৃথিবীর সব বস্তুরই উৎপত্তি ঘটেছে। অ্যারিস্টট্‌ল্ বস্তুজগতের মূল কারণস্বরূপ এক সূক্ষ্মদেহী আত্মা বা হোলি ঘোস্ট-এর কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে এই আত্মার সংযোগে যে কোনও বস্তুর রূপান্তর সম্ভব। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস্ বললেন যে সব বস্তু পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুগুলির বিন্যাস বদলালে বস্তুর স্বরূপও বদলাবে। অ্যারিস্টট্‌ল ও ডেমোক্রিটাসের বস্তুতত্ত্ব যে কোনও ধাতু থেকেই সোনা উৎপাদনের প্রেরণা দিল।

প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন যে সোনার মূলে বিরাজ করছেন 'তা' নামে দেবতা। তিনি কৃপা করলেই যে কোনও ধাতু সোনাতে রূপান্তরিত হতে পারে। প্রাচীন আলেক্‌জেন্‌ড্রিয়াতে ধাতু রূপান্তরের একটি পদ্ধতি পরিকল্পিত হয়েছিল। এই পদ্ধতি অনুযায়ী রূপান্তরের পূর্বে ধাতুর মৃত্যু ঘটানো দরকার। ধাতুকে কালো করে তুললেই নাকি তার কাল হয়। তারপর কালো ধাতুকে রূপা, পারদ, টিন প্রভৃতি ধাতু দিয়ে গরম করলে কালোর মধ্যে আলো ফুটে ওঠে—কালো ধাতু সোনাতে রূপান্তরিত হয়।

আলেক্‌জেন্‌ড্রিয়াতে মেরী নামে জনৈক ইহুদী মহিলা সীসা, তামা ও গন্ধককে একত্র পুড়িয়ে একটি কালো বস্তু প্রস্তুত করেছিলেন। এই কালো বস্তুটি মেরীর কালো (মেরীস ব্লাক) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কালো বস্তুটি থেকে সোনা প্রস্তুতের প্রয়াস মেরী করেছিলেন।

কালো ধাতু থেকে সোনা তৈরি করার কৌশল ব্লাক আর্ট নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে অ্যালকিমিকেও ব্লাক্ আর্ট বলা হত।

অ্যালকিমির জনক হলেন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের একজন আরবদেশীয় চিকিৎসক, জবীর-ইব্‌ন্-হায়ান। অ্যালকিমির চর্চা আরব থেকে য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

অ্যালকিমির উদ্দেশ্য হল : নিম্নবর্ণের ধাতু (যথা তামা, লোহা ইত্যাদি) থেকে উচ্চবর্ণের ধাতু (যথা সোনা ও রূপা) উৎপাদন এবং একটি সর্বরোগহর

ওষুধ আবিষ্কার। সব রোগের নিরাময় শুধু নয়, মানুষকে অমর করে দেওয়ার বাসনাও ছিল অ্যাল্‌কেমিষ্টদের। তাঁরা অমৃত বা ইলিক্‌স্যার (elixir) আবিষ্কারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। জবীর-ইব্‌ন্‌-হায়ান বিশ্বাস করতেন যে সোনার মধ্যে একটি স্বচ্ছ ঝলমলে লাল রঙের তরল পদার্থ আছে, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'টিংচার'। এই টিংচার অন্য কোন ধাতুতে নেই। টিংচারের সংযোগে যে কোনও ধাতু স্বর্ণমণ্ডিত হবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।



প্রাচীন খনির মধ্যে সন্ধান

প্রাচীন চীনের দার্শনিকেরা পরশ-পাথরের (ফিলসফার্স ষ্টোন) অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। পরশপাথরের স্পর্শে যে কোনও ধাতু সোনায় পরিণত হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস ছিল। চীনেরা এমন একটি ইলিকস্যার-এরও সন্ধান করেছিলেন যার সংযোগে পারদ ও সীসা সোনা বা রূপায় রূপান্তরিত হতে পারে।

আল্‌কিমির ভেলকিতে যখন দার্শনিকদের চিন্তা আচ্ছন্ন, তখন খানিকটা আলোর স্ফুলিঙ্গ আমরা কয়েকজন দার্শনিকের লেখার মধ্যে পাই। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রোমান দার্শনিক প্লিনি খনিজ পদার্থসমূহের বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনা বিজ্ঞানসম্মত না হলেও খনিজগুলিকে চিনে নিতে খানিকটা সাহায্য করে। খ্রীষ্টীয় এগার শতকে বোখারার অ্যাভিসিয়েনা খনিজ পদার্থগুলিকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথম ভাগে ছিল মাটি, দ্বিতীয় ভাগে গন্ধক ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ, তৃতীয় ভাগে লবণ এবং চতুর্থ ভাগে ধাতু।

অ্যাভিসিয়েনার পর একটানা সাত শতক ধরে খনিজ রইল অ্যালকিমির আওতায়। তারপর ষোড়শ শতকে ইটালির বিরিংগুকিও এবং জর্জিয়াস্ এগ্রিকোলা বৈজ্ঞানিকভাবে খনিজ পদার্থসমূহের বর্ণনা করেন। খনিজ পদার্থগুলিকে এগ্রিকোলা দাহ্য খনিজ, মাটি, লবণ, রত্ন, ধাতু এবং মিশ্র খনিজ, এই ছয়ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেন।

পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খনিজ বিচার আরম্ভ হল অষ্টাদশ শতকে। এই কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন রাশিয়ার মিখাইল লমনসভ্ এবং সুইডেনের কে, লিনিয়ুস।

খনিজতত্ত্ব এখন বিজ্ঞানের দখলে। খনিজের জন্য সন্ধান ভূবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চলে। কিন্তু এমন অনেক সন্ধানী আজও পৃথিবীময় খনিজ সন্ধানে প্রবৃত্ত আছেন, যাঁদের বিজ্ঞানের জ্ঞান নেই, কিন্তু সন্ধানের ঝোঁক আছে। সন্ধানের নেশায় তাঁরা বনে-পাহাড়ে বিচরণ করছেন। তাঁদের সন্ধানের ফলে অনেক উল্লেখযোগ্য খনিজের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে।

॥ ২ ॥

হাত ও হাতিয়ার

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, প্রায় দশ লাখ বছর আগে জীবজগতের বিবর্তনক্রমে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম মানুষ জৈব সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষ হলেও অন্যান্য প্রাণিদের থেকে তার বিশেষ তফাৎ ছিল না। আদিম মানুষ ছিল দেহসর্বস্ব—দেহের জৈব ধর্মগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তার জীবন। কিন্তু দেহসর্বস্ব হলেও দেহই যে সব নয়, তা বুঝতে অবশ্য তার দেরী হয় নি। কারণ অন্যান্য প্রাণিদের তুলনায় দেহের বলে সে হীন, তার হাত, পা, নখ বা দাঁতের মধ্যে আত্মরক্ষা বা আক্রমণের উপযোগী শক্তির অভাব। নখী বা দন্তিদের মত

নখ বা দাঁতকে মানুষ যথেচ্ছ প্রয়োগ করতে পারে না, একমাত্র ভরসা তার হাত দুটি। আঘাত হানতে বা এড়াতে হাতই তার সম্বল।

কিন্তু মানুষের হাতের বলও বহুল নয়, বন্য জন্তুদের বলপ্রয়োগের সামনে তা নিতান্তই দুর্বল। বন্য হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে শুধু হাতে হাতাহাতি করে মানুষ কখনো সফল হয় নি—হাতকে সবল করে তুলতে তার হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়েছে।

আদিম মানুষের আবাস ছিল পাহাড়ের গুহা। গুহার আধার প্রস্তরময়। কঠিন পাথরের আবেষ্টনী তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে। পাথরের আশ্রয়ে থাকতে থাকতে পাথরের কাঠিন্যের মধ্যে সে আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্রনির্মাণের প্রেরণা পেয়েছে।

মানুষের প্রথম হাতিয়ার তৈরী হল পাথর দিয়ে। প্রথম প্রয়াসে পটুত্বের অভাব ছিল। পাথরকে ভেঙে ছুঁচালো করার চেষ্টা করা হলেও তাতে ভারই ছিল, ধার ছিল না। পাথরের হাতিয়ার নির্মাণের এই আদি পর্বকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেছেন পুরোন প্রস্তরযুগ।

ক্রমশঃ পাথরকে পালিশ করে মসৃণ করার কৌশল আয়ত্ত করল মানুষ। পাথরকে পালিশ করে সে শানিয়ে তোলে—পাথর দিয়ে ধারালো অস্ত্রের ফলা তৈরী করে। পাথর দিয়ে হাতিয়ার নির্মাণের এই নৈপুণ্য মানব সভ্যতায় নয়াপ্রস্তরযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরী করতে গিয়ে মানুষ ফ্লিন্ট নামে পাথরের সন্ধান পেয়েছে। ফ্লিন্ট কোয়ার্টজ নামক খনিজের সমগোত্রীয়—মজবুত, শক্ত, অথচ হালকা। হালকা হলেও পলকা নয়। তাকে ঘষে ছুরি বা কাস্তের আকার দেওয়া হত।

অস্ত্রনির্মাণে ফ্লিন্ট জনপ্রিয় হলেও অন্যান্য পাথর দিয়েও হাতিয়ার তৈরী করা হত। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে অবসিডিয়ান। অবসিডিয়ান কাঁচের মতই হাল্কা ও ধারালো। কাঁচের জৌলুসও তাতে আছে। কাঁচের মত অবশ্য তা ভঙ্গুর নয়। আগ্নেয়গিরি থেকে অবসিডিয়ানের উৎপত্তি। আদিম মানুষ অবসিডিয়ান ঘষে প্রায় ইস্পাতের ছোরার মত ধারালো ছোরা বানাত। মেক্সিকোর অ্যাজটেক নামে আদিবাসী সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অবসিডিয়ানের হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। নয়াপ্রস্তরযুগের এই হাতিয়ারকে তারা লোহা ও ইস্পাতের যুগেও পরিহার করতে পারে নি।

নব্যপ্রস্তরযুগের পাথরের অস্ত্রের অনেক নমুনা প্রত্নতাত্ত্বিকরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছেন। নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত হলেও অস্ত্রগুলি প্রায় একই ধরনের। প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন যে, সম্ভবত কোনও এক বিশেষ অঞ্চলে তৈরী হোত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র। সেখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তা সরবরাহ করা হোত। কোনও এক বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে পাথরের অস্ত্রনির্মাণের কুশলতা সীমাবদ্ধ ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন।



খনিজের খোঁজে খোঁড়াখুঁড়ি

যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রায় ছ' হাজার বছর আগে কৃষিকর্ম মানুষের আয়ত্তে আসে। তখন ধাতুর ব্যবহার শিখলেও পাথরের হাতিয়ার বর্জন করে নি মানুষ। তখনো পাথরের অস্ত্রেই মানুষের আস্থা ছিল বেশী ধাতু দিয়ে অস্ত্র তৈরীর কথা সে ভাবে নি।

কৃষিকর্মের জন্য আদিম লাঙলের ফলাতে ব্যবহৃত হোত ফ্লিণ্ট-বসানো হাড়। বড় আকারের হাড়ের গায়ে থাকতো ছোট ছোট ফ্লিণ্টের টুকরো। হাড় ও পাথরের সমন্বয়ে প্রস্তুত লাঙলের ফলা মাটিকে ফালা ফালা করত অনায়াসে।

ক্রমশ ধাতু মানুষের ধাতস্থ হতে পাথরের বদলে ধাতু দিয়ে হাতিয়ার তৈরী হতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব তিন থেকে চার হাজার অব্দের মধ্যে ধাতুর প্রাধান্য শুরু হয়।

প্রস্তরযুগ এখন দূরস্মৃতি। পাথরের হাতিয়ার এখন জাদুঘরের শোকেসে স্থান পেয়েছে। মানুষের নিত্যব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ধাতু দিয়েই তৈরী হয়।

কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার অত্যাবশ্যক সব উপকরণ যদিও ধাতুময়, পাথরের অন্তর্নিহিত শক্তি অন্ততপক্ষে পাথর ভাঙার ব্যাপারে এখনো স্বীকৃত। পাথর বা রত্ন পালিশ করতেও পাথরেরই প্রয়োজন।

পাথর বা খনিজকে শান দেওয়া বা পালিশ করার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় কুরুবিন্দ বা কুরুন্দ, হীরা বা গারনেট।

কুরুবিন্দ চুনি ও নীলার স্বজাতি, কিন্তু স্বচ্ছ নয়। চুনি ও নীলার মত আলু-মিনিয়াম ও অক্সিজেনের সমাহার, অত্যন্ত কঠোর। তার কঠোরতার দরুন তাকে চূর্ণ করে শান দেবার কাজে লাগানো হয়। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে অস্ত্র শানাবার এবং রত্ন পালিশ করবার জন্য কুরুবিন্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। সংস্কৃত কুরুবিন্দ থেকেই কোরানড্যাম নামটি এসেছে। আসাম, মাদ্রাজ, মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে কুরুবিন্দ পাওয়া যায়। বিদেশে দক্ষিণ রোডেশিয়াতে কুরুবিন্দের উৎকৃষ্ট ভাণ্ডার আছে।

সুদৃশ্য গারনেট হোল রত্ন। সাধারণ গারনেটকে তার কঠোরতার দরুন শান দেবার কাজে লাগানো হয়ে থাকে। এ জাতীয় গারনেটের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আছে মাদ্রাজ, কেরালা, রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশে।

হীরা বস্তুজগতে কঠোরতম। হীরার মধ্যে যা অস্বচ্ছ শ্রেণীর, শক্ত পাথর কাটা বা রত্ন পালিশ করার জন্য তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হীরা কাটতে হীরার গুঁড়োই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এদেশে হায়দরাবাদের অদূরবর্তী গোলকুণ্ডা হীরাতে সমৃদ্ধ ছিল। সেই ভাণ্ডার এখন নিঃশেষ, মধ্যপ্রদেশে পান্নার স্বল্প ভাণ্ডারই এদেশে একমাত্র ভরসা। পান্নার অস্বচ্ছ জাতের হীরাই বেশী পাওয়া যায়। কঠোরতাই তার সম্বল—পালিশ ও কাটার কাজেই তার ব্যবহার।

পাথরের হাতিয়ারের চলন এখন না থাকলেও হাতিয়ার হিসেবে পাথর হাতে

নিতে মানুষ যে দ্বিধাবোধ করে না, তার প্রমাণ বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। বন্দুক দিয়ে গোলা-গুলী ছোঁড়া থেকে শুরু করে ছোরাছুরি চালান, সবেতেই শিক্ষার প্রয়োজন। অশিক্ষিত পটুত্ব দিয়ে সামান্য পেন্সিল কাটা ছুরিকেও ঠিকমত বাগে আনা যায় না। কিন্তু পাথর হাতে তুলতে সকলেই পারে, শিশুর পক্ষেও তা সহজ।

মানুষের হাত যেন হাজার হাজার বছর ধরে প্রস্তরযুগের স্মৃতিকে বহন করছে।

॥ ৩ ॥

মৃৎপাত্র

প্রাক-ইতিহাসের মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কৃষির আবিষ্কার। মানুষের সব আবিষ্কারের মধ্যে সেরা এই আবিষ্কারটি হয়েছিল আ নুমানিক আজ থেকে প্রায় আট হাজার বছর আগে।

কৃষি মানে শস্য ফলানো। কিন্তু ফলানো ফসলকে ফলের মত কাঁচা খেতে ভাল লাগে না। তাকে আগুনে ঝলসে সহজপাচ্য করে নিতে হয়। আগুনের পরশমণি খাদ্যের ভেতরকার কঠোরতাকে কমনীয় করে মানুষের জঠরের উপযোগী করে তোলে। কিন্তু আগুন যত না নরম করে, তার চেয়ে বেশি করে পোড়ায়। কা জই সোজাসুজি আগুনে না ছুঁইয়ে আগুনের তাতে কাঁচাকে পাকা করে তোলার কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করে মানুষ। তার এই চেষ্টার ফল হল মাটির পাত্রের আবিষ্কার।

মাটির তৈরী প্রাচীনতম যে পাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকদের সন্ধানে এসেছে, তা প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছরের পুরোন। প্রথম পাত্র জমাট-বাঁধা কাদা-মাটির আধার মাত্র—তাতে আগুনের ছোঁয়া লাগে নি। আগুনে পোড়ানো পাত্র প্রস্তুত করতে অনেক সময় লেগেছে। সাড়ে ছ' হাজার বছর আগে আগুনে অল্প-স্বল্প ঝলসে মাটির পাত্র তৈরী করেছে মানুষ। আগুনে পুরোপুরি ঝলসানো পাত্র প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছে সে প্রায় ছ' হাজার বছর আগে। আগুন তখন পুরোপুরি

মানুষের আয়ত্তে এসেছে। বড় বড় চুল্লী তৈরী করে তার মধ্যে মাটির তৈরী পাত্রগুলিকে সাজিয়ে তাদের আগুনে পুড়িয়েছে সে।

মাটির পাত্র ঝলসাবার চুল্লীর মধ্যেই খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কৌশল আবিষ্কার করেছে মানুষ। পাত্রগুলি মাটির তৈরী হলেও মাটির মধ্যে মাঝে মাঝে তামা, লোহা বা অন্য কোনও ধাতুযুক্ত খনিজের চূর্ণ প্রচ্ছন্নভাবে মিশে থেকেছে। কাঠের অঙ্গার ও আগুন দুয়ের প্রভাবে মাটি পুড়ে জমাট বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত তামা, লোহা বা অন্য কোনও ধাতু মাটি বা খনিজের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। মাটির পাত্রকে আগুনে পুড়িয়ে পাকা করতে গিয়ে মাটির অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছে মানুষ।

মাটির পাত্রের পর কাঁচের পাত্র তৈরী করার কৌশল মানুষের আয়ত্তে এল। প্রথম কাঁচ ইজিপ্টে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল। কাঁচ দিয়ে প্রথম প্রথম অলঙ্কার তৈরী করা হত। কাঁচের গুঁতিকে মালার আকারে গেঁথে গলায় পরত মিশরী মেয়েরা। অলঙ্করণের ক্ষেত্র পেরিয়ে পাত্রস্থ হতে কাচের সময় লেগেছে অনেক।

রকমারি পাত্র প্রস্তুতে কাঁচের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হলেও কাচ কখনো পাত্র-বদ্ধ হয়ে থাকে নি। অপাত্রেও তার রকমারি উপযোগিতা। স্বচ্ছতার দরুণ কাঁচ দিয়ে আয়না ও লেন্স তৈরী হয়েছে। জৌলুসে তা হীরা-মানিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এখনো অলঙ্করণে তার সমান সমাদর।

সাধারণ মাটি পুড়িয়ে তৈরী করা পাত্র আদিম থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমান সমাদরের সঙ্গে ব্যবহৃত। কিন্তু সাদামাটা মাটিতে মানুষের মন ভরে না, কাজেই সাদা মাটির দিকে তার নজর পড়েছে। সাদা মাটি চীনে মাটি নামে সুপরিচিত। চীনদেশেই তার প্রথম আবিষ্কার। এই মাটির বৈজ্ঞানিক নাম হল 'কেওলিন'। চীনের কাউ-লিং পাহাড়ে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই মাটি জনৈক ফরাসী মিশনারীর নজরে পড়ে। পাহাড়ের নামে মাটির নামকরণ করেন তিনি। দেখা-মাত্র এই মাটিকে পাত্রে রূপান্তরের প্রেরণা পান ফ্রান্স ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরা। তার শুভ্রতা য়ুরোপের সকলের মনোহরণ করেছিল।

য়ুরোপীয়দের গোচরে আসার অনেক আগেই অবশ্য চীনদেশে কেওলিন দিয়ে পাত্র তৈরী করা হয়েছে। সাদা মাটির পাত্রের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরোন নিদর্শন চীনদেশে পাওয়া গেছে।

ভারতে মাটির পাত্র সমধিক সমাদৃত হলেও কাঁচের স্বচ্ছতাও প্রাচীনকালে ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মহাভারতে স্বচ্ছ স্ফটিকের পাত্রের উল্লেখ আছে। সাদা মাটির পাত্রের প্রাচীন নিদর্শন এ পর্যন্ত এদেশে আবিষ্কৃত না হলেও, সাদা মাটি যে প্রাচীন ভারতীয়রা ব্যবহার করতেন তার প্রমাণ পাই আমরা আদিবাসীদের বাসগৃহে। আদিবাসীরা তাদের ঘরবাড়ির দেওয়ালে সাদা মাটির প্রলেপ দেয় সযত্নে।

আদিবাসীদের মধ্যে আদিম মানুষকে প্রায় অবিকৃতভাবে পাওয়া যায়। তাদের নিত্যব্যবহৃত বস্তুগুলি আদিমতম কাল থেকে তাদের জীবনযাত্রার আবশ্যিক উপকরণ হয়ে আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সাদা মাটির শুভ্রতায় তাদের আবাসস্থল নিঃসন্দেহে সুপ্রাচীন কাল থেকে মণ্ডিত হচ্ছে।

মাটি, চীনামাটি বা কাঁচ দিয়ে তৈরী পাত্র প্রাচীন থেকে আধুনিক সকল মানুষের কাছেই সমান অপরিহার্য। প্রায় চিরকাল মানুষ পাত্রস্থ হয়ে আছে এবং থাকবেও। কাজেই পাত্রের প্রস্তুতিপর্ব তার শিল্পপ্রচেষ্টার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে।

পাত্র প্রস্তুতের উপকরণগুলির অধিকাংশ মাটি বা খনি থেকে আহরণ করা হয়। উপকরণগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হল মাটি। মরু বা পর্বত বাদে পৃথিবীর সর্বত্র মাটি আছে। মাটির বিশেষত্ব হল এই যে, মাটির স্তর থেকে তা যতই নেওয়া হোক না, তার ভাণ্ডার কখনো ফুরাবে না। জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় শিলাস্তরগুলি ক্ষয় হয়ে মাটির স্তরকে সর্বদা সমৃদ্ধ করছে। প্রয়োজনমত যেটুকু মাটি মানুষ খুঁড়ে নেয়, তার চেয়ে বেশী প্রকৃতি ফেরত দেয়। অতএব মাটির ভাণ্ডারের শেষ নেই।

কাঁচের প্রধান উপকরণ হল বালি ও সোডা। তাছাড়া অল্প বিস্তর অ্যালুমিনা, অ্যান্টিমনি অক্সাইড ইত্যাদির প্রয়োজন। বালি ও সোডায় ভারত ও পৃথিবীর প্রায় সব দেশই সমৃদ্ধ।

চীনামাটির বাসন তৈরী করতে প্রধানত দরকার হয় সাদা চীনামাটি বা কেওলিন। কেওলিন ফেল্ডস্পার নামক খনিজের ক্ষয়ের অবশেষ। ভারত কেওলিনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই কেওলিন পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কেওলিন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে রয়েছে।

চীনামাটির উৎকর্ষ বাড়াবার জন্য কেওলিনে ফেল্ডস্পার মেশাতে হয়। ফেল্ডস্পার খুব সাধারণ খনিজ, গ্রানিট পাথরে প্রচুর পরিমাণে থাকে। কিন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ফেল্ডস্পার তেমন সুলভ নয়। ফেল্ডস্পারকে অবিকৃতরূপে পেলে তার মধ্যে নির্মল শুভ্রতা দেখা যায়, তাতে মুক্তার জৌলুসও ফুটে ওঠে। কোনও কোনও ফেল্ডস্পার তার জৌলুসের জন্য রত্নের মর্যাদা পায়।

সাদা ফেল্ডস্পারের শুভ্রতা এমনি নির্মল হয়ে থাকে যে, তা দিয়ে কৃত্রিম দাঁত তৈরী করা হয়। সম্প্রতি সাদা ফেল্ডস্পার দিয়ে সাদা সিমেণ্টও তৈরী করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে ষ্টেনলেস ষ্টিলের ওপর আমাদের আসক্তি বেড়েছে। মাটি, চীনামাটি বা কাঁচের বাসন বাদ দিয়ে অনেকে ষ্টেনলেস ষ্টিলের বাসন ব্যবহার করেন। কেটলি, পেয়ালা, থালাবাটি ইত্যাদি সবরকম বাসন ষ্টেনলেস ষ্টিলের হলেই মন ভরে তাঁদের।

কিন্তু মাটি, চীনামাটি বা কাঁচের পাত্র যেন শিল্পীর পট। তাদের গায়ে শিল্পী অনেক সূক্ষ্ম শিল্পসৌকর্য ফুটিয়ে তোলেন। কাজেই মাটি বা কাঁচের সঙ্গে ধাতু স্থানবদল করবে এমন সম্ভাবনা নেই।

॥ ৪ ॥

ভাল-বাসা

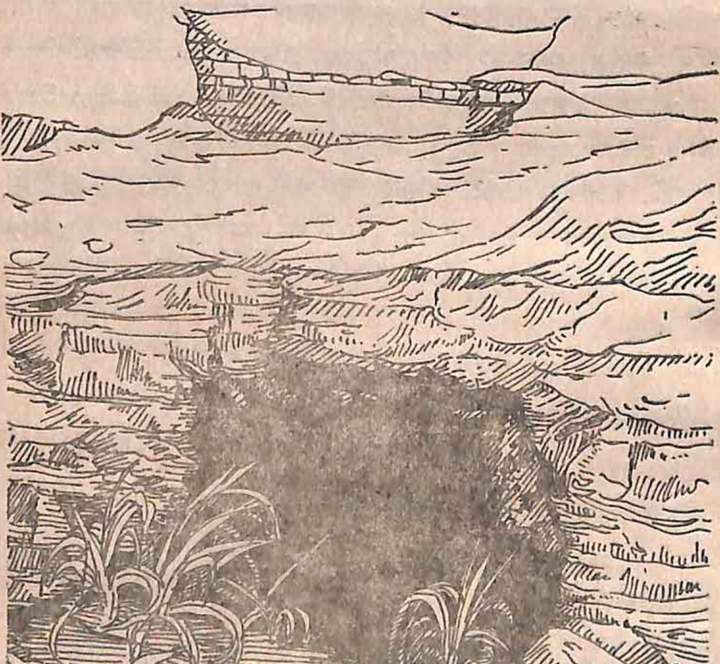
মানুষের সবচেয়ে বড় সাধ বাসা বাঁধার। চিরদিনের আবাস নয় জেনেও চারদিক ঘেরা ঘরের প্রতি মানুষের প্রচণ্ড আসক্তি। এই সাধের প্রেরণায় সে সৌধ গড়ে। সাধ্য না থাকলেও মেঘের ওপরে প্রাসাদ গড়ার স্বপ্ন দেখে।

পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে নিজেকে অসহায় বোধ করেছিল। প্রকৃতির কোলে লালিত হলেও প্রকৃতির কবল থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ সে অনুভব করেছিল। তাই আশ্রয় খুঁজেছিল সে।

মানুষের প্রথম আশ্রয় অবশ্য প্রকৃতিরই রচনা। পাহাড়ে প্রাকৃতিক ক্ষয়ের

ক্রিয়ায় শিলাস্তর বিশ্লিষ্ট হয়ে গুহা বা গহ্বরের সৃষ্টি হয়। গুহায় নিহিত ছিল মানুষের প্রথম আশ্রয়।

গুহার আধার পাথর দিয়ে ঘেরা। গুহা থেকে ঘর গড়ার প্রেরণা পেল মানুষ। আদিম মানুষের প্রথম ঘর গুহার অনুকরণেই তৈরী হয়েছিল। আদি ঘর-বাড়ির কিছু নিদর্শন ইরাকের জেরিকোতে দেখা যায়। এখানে সাত হাজার বছরেরও আগেকার একটি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। একসঙ্গে জড়াজড়ি করা ঘর-বাড়ি সব পাথরের গড়া। পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে। গ্রামকে ঘিরে আছে পাথরের দেয়াল।



প্রাচীন গুহার মুখ

পাথর দিয়ে মানুষ যেমন সৌধ নির্মাণ করেছে, তেমনি সমাধিও রচনা করেছে। মৃতের স্মৃতিকে পাথরের ফলকে চিরস্থায়িভাবে উৎকীর্ণ করে রাখতে চেয়েছে সে।

পাথর ছাড়া মাটি দিয়েও ঘর গড়েছে আদিম মানুষ। মাটি পুড়িয়ে ইঁট তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করতে অবশ্য তার অনেক সময় লেগেছে।

আধুনিককালে ইঁট, সুরকি ও কংক্রিট্ ক্রমশঃ পাথরের জায়গা নিলেও গৃহ-নির্মাণে পাথর কদাপি বর্জিত হয়নি। স্থপতিতে পাথরের নিজস্ব মর্যাদা আজও আছে। গৃহনির্মাণে জ্যামিতিক ছক ছাপিয়ে শিল্পসৌকর্যের দাবী উঠতেই পাথরের প্রয়োজন হয়েছে। পাথরের কণায় কণায় উৎকীর্ণ প্রকৃতির ভাস্কর্যকে বাড়ির দেয়ালে এনে সাজানো হয়েছে।

পাথরকে থরে থরে সাজিয়ে আকাশছোঁয়া সৌধ, মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি রচনা করেছে মানুষ। এই সব পাথরই হল পৃথিবীর অস্থিপঞ্জর। কাজেই প্রায় সর্বত্রই তারা সুলভ।

ব্যাসল্ট্ এমনি একটি পাথর, যা পৃথিবীর অনেকখানি জুড়ে আছে। ভূগর্ভ থেকে নিঃসৃত গলিত লাভা ঠাণ্ডা হয়ে জড়ীভূত হয়ে ব্যাসল্টে রূপ নিয়েছে। রঙ কালো, দানা সূক্ষ্ম। খুব শক্ত হয়ে জমাট বাঁধাতে সহজে তাকে ভাঙ্গা যায় না। পাকা রাস্তা তৈরি করতে বা রেল লাইন পাততে এ পাথর অপরিহার্য। বড় বড় সেতু নির্মাণেও লাগে এ পাথর। সৌধ নির্মাণে অবশ্য তার তেমন সমাদর নেই। কারণ ইচ্ছামত আকারে তাকে কাটা সহজ নয়, তার নিবিড় কালো রঙও অনেকের পছন্দ নয়।

ব্যাসল্ট্ দিয়ে সাধের সৌধ নির্মিত না হলেও প্রাচীন ভাস্করদের ছেনি অপরূপ সব ভাস্কর্য উৎকীর্ণ করেছে তার গায়ে। অজন্তা, ইলোরা, এলিফাণ্টা, কান্হেরি প্রভৃতি গুহামন্দিরগুলিতে খোদিত ভাস্কর্য ও চিত্রিত বিচিত্র সব দেয়াল-চিত্র ব্যাসল্টের কালোকে আলো করেছে।

ভারতে রাজমহল পাহাড়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র, প্রভৃতি প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাসল্টে ঢাকা।

ব্যাসল্টের মত গ্র্যানিট্ও পৃথিবীর অনেকখানি অংশকে আবৃত করে আছে। ভূগর্ভে নিহিত গলিত লাভা প্রবল চাপে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে গ্রানিটের সৃষ্টি করেছে। গ্র্যানিটের দানাগুলি এমনি সুসংবদ্ধভাবে আছে যে, দেখতে একটি সুন্দর নকশার মত মনে হয়। ধূসর, গোলাপী, লাল, কালো প্রভৃতি নানা রঙের গ্র্যানিট্ পাওয়া যায়। দৃঢ় হলেও তাকে ইচ্ছেমত আকারে কাটা খুবই সহজ। কাজেই মন্দির, মিনার বা প্রাসাদ নির্মাণে গ্র্যানিটের

বহুল ব্যবহার হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য মন্দির এবং মন্দিরে স্থাপিত মূর্তি গ্র্যানিট্ দিয়ে তৈরি।

গ্র্যানিট্ ভারতের নানা জায়গায় আছে। কিন্তু মন্দির বা সৌধ নির্মাণের উপযোগী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গ্র্যানিট্ মাদ্রাজ ও মহীশূরেই পাওয়া যায়।

বালি জমাট বেঁধে বেলেপাথরে রূপান্তরিত হয়। বেলেপাথরের বালির সঙ্গে অল্পবিস্তর চুন ও লোহাও মিশে থাকে। লোহার পরিমাণ বেশি থাকলে বেলে-পাথরের রঙ হয় লাল।

বেলেপাথর ব্যাসল্ট্ বা গ্র্যানিটের মত শক্ত নয়, তাকে ইচ্ছেমত আকারে কাটা খুবই সহজ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাসাদ বা মন্দির নির্মাণে বেলেপাথরের সমাদর ছিল। প্রাসাদাদি তৈরি করতে এর চেয়ে ভাল পাথর বোধহয় আর কিছু নেই।

ভারতের বহু রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বেলেপাথর আছে। ইমারত তৈরির উপযোগী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বেলেপাথর বিন্ধ্য পর্বত ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায়। পূর্বে গয়া জেলা থেকে পশ্চিমে গোয়ালিয়র পর্যন্ত এই বেলে-পাথরের বিস্তার। লোহার পরিমাণ বেশি বলে তার রং লাল। আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রির কেল্লা, দিল্লীর জুম্মা মসজিদ ও বহু প্রাসাদ, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র এবং উত্তর প্রদেশের অনেক স্থানের অনেক ইমারত এই লাল বেলেপাথর দিয়ে তৈরি। পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি উড়িষ্যার বেলেপাথর দিয়ে গড়া। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরগুলির অধিকাংশ মূর্তি বেলেপাথর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে।

স্লেট্ কাদাপাথরের রূপান্তরিত রূপ। ভূগর্ভের তাপে ও চাপে কাদাপাথর কালো বা ধূসর স্লেটের রূপ নেয়। স্লেট্ কঠিন নয়, আঁচড় দিলেই দাগ পড়ে তাতে। স্লেট্‌কে স্তরে স্তরে বিশ্লিষ্ট করা সহজ। চাপ দিলেই তা পাতের আকারে ভাগ হয়ে যায়। স্লেটের পাত দিয়ে ঘরের ছাদ ছাওয়া ও মেঝে মুড়ে দেওয়া চলে।

ভারতে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের হিমালয় অঞ্চলে স্লেট্ আছে। বিহারে মুঙ্গের জেলার খড়্গপুর পাহাড়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর স্লেট্ পাওয়া যায়।

সৌধ বা সমাধি নির্মাণে শ্বেতপাথরের সমাদরের শুরু মোগল বাদশাদের আমল থেকে। শাহ্‌জাহানের তৈরী সৌধ ও সমাধি সবই শ্বেতপাথরে প্রস্তুত। তাজ-মহল পুরোপুরিশ্বেতপাথর দিয়ে নির্মিত।

শ্বেতপাথরের শুভ্রতা স্বপ্নিল পরিবেশ রচনা করে। তাজমহলের সৌন্দর্যের মূলে রয়েছে শ্বেতপাথরের শুভ্রতা। তার স্থাপত্যের কুশলতাকে ছাপিয়ে গেছে শ্বেতপাথরের শুভ্র দ্যুতি।

আধুনিককালেও শ্বেতপাথরের বিশেষ সমাদর আছে। প্রাসাদাদি নির্মাণে তা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। কলকাতায় শ্বেতপাথরের তৈরী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তাজমহলকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফারসীতে শ্বেতপাথরকে বলে মর্মর। ভূগর্ভের চাপ ও তাপের প্রভাবে চুনাপাথর শ্বেতপাথরে রূপান্তরিত হয়। বিশুদ্ধ শ্বেতপাথরের রঙ সাদা। অন্যান্য পদার্থের মিশ্রণে তাতে নানা রকম রঙের নকসা ফুটে ওঠে।

রাজস্থানের যোধপুর, কিষেণগড়, জয়সলমির, আজমির, জয়পুর, আলোয়ার প্রভৃতি জায়গা এবং মহারাষ্ট্রের কয়েকটি স্থানে শ্বেতপাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রাসাদাদি নির্মাণের উপযোগী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শ্বেতপাথর রাজস্থানেই মেলে। যোধপুরের অন্তর্গত মেকরানার শ্বেতপাথর তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। তাজমহল ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল মেকরানার শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে।

যে সব পাথরে লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বেশি, জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় তারা ক্ষয় পেয়ে ইঁটের মত লালচে রঙের পাথরে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরিত পাথরকে বলে ল্যাটেরাইট। ল্যাটিন ভাষায় laterite মানে ইঁট। ইঁটের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে এই নামকরণ হয়েছে। ল্যাটেরাইট অনেক জায়গায় মাটির সঙ্গে মিশে মাটির মতই নরম হয়ে থাকে। তাকে খুঁড়ে বের করলে অবশ্য হাওয়া লেগে ক্রমশঃ শক্ত হয়ে ওঠে। চাপ দিলে ভাঙ্গা ল্যাটেরাইটে জোড়াও লেগে যায়।

ঘর-বাড়ি তৈরি করার জন্য ল্যাটেরাইটের ব্যবহার খুবই প্রাচীন। ল্যাটেরাইট দিয়ে ঘর গড়ার সুবিধে এই যে, সদ্য খুঁড়ে আনা ল্যাটেরাইট দিয়ে গাঁথনি করার সময় চুন-সুরকির দরকার হয় না। ল্যাটেরাইটের তৈরী ঘর-বাড়ি উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় দেখা যায়।

ল্যাটেরাইটের অনুকরণে মাটি পুড়িয়ে ইঁট তৈরি করার কৌশল খুব প্রাচীনকালেই মানুষের আয়ত্তে এসেছিল। প্রাচীনকালে ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে বিশাল সৌধ পর্যন্ত গড়ে তোলা হত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধমালা এবং রাজগৃহের মন্দিরগুলি ইঁটের তৈরি। নালন্দা বা রাজগৃহে ব্যবহৃত ইঁট অবশ্য আধুনিক ইঁটের মত নয়। এই ইঁট আধুনিক ইঁটের চেয়ে চ্যাপ্টা এবং আকারে অনেক বড়।

মাটি পুড়িয়ে ইঁট করার সামর্থ্য যাদের নেই, কাঁচা মাটি দিয়ে তারা ঘর বানায়। পাথর বা ইঁটের স্থায়িত্ব আছে, সময়ের প্রলেপ তাদের ওপরে পড়লেও অতীতের সাক্ষী হয়ে থেকে যায় তারা। কিন্তু মাটির প্রবণতা মাটিতে মিশে যাওয়া। অতীতে মাটি দিয়ে যে সব ঘর-বাড়ি গড়া হয়েছিল, তাদের কোন চিহ্ন আজ আর অবশিষ্ট নেই। কাজেই প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রাগৈতিহাসিক মাটির ঘরের ওপরে সবিশেষ আলোকপাত করতে সমর্থ হননি।

আধুনিককালে অবশ্য মাটির ঘরের তেমন সমাদর নেই। মাটির কাছাকাছি যারা আছে, তারাও সামর্থ্য থাকলে ইঁট বা পাথরের পাকা দালান তোলে।

এদেশের গ্রামগুলিতে অবশ্য বেশির ভাগ ঘরবাড়ি মাটির। দরিদ্র গ্রামবাসিদের অধিকাংশের সহজ নাগালের মধ্যে মাটি ছাড়া আর কিছু নেই বলে তারা মাটিরই ঘর গড়ে। কিন্তু গ্রামগুলি যদি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, গৃহ-নির্মাণে কাঁচা মাটি বর্জন করে সকলে পোড়া মাটি বা ইঁটের সাহায্য নেবে।

ব্যতিক্রম যে থাকবে না তা নয়। মাটির ঘরের মোহ অনেকের মনকেই আচ্ছন্ন করে আছে।

॥ ৫ ॥

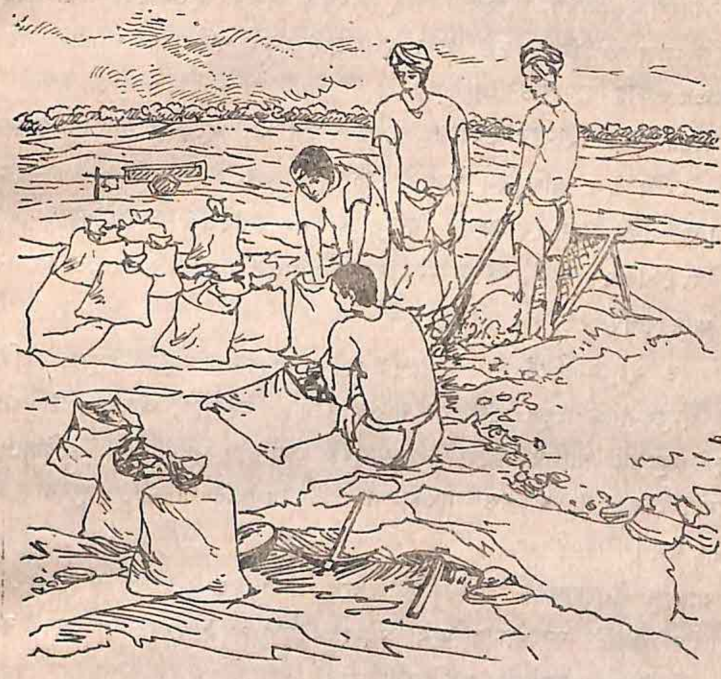
রঙের জন্য

রঙের জন্য মানুষের মন কবে থেকে মজল তা প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলতে পারবেন না। মানুষের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির মধ্যেও আদি মানুষের রঙের প্রতি আসক্তির চিহ্ন দেখা যায়।

রঙের প্রথম প্রয়োজন প্রসাধনের জন্য। পরিমিতিবোধ আদিম মানুষের বোধের অগম্য ছিল, নিজেদের সর্বাঙ্গ রাঙিয়ে তারা আনন্দ পেত।

কেবলমাত্র নিজেদের রঞ্জিত করে ষোল আনা মনোরঞ্জন হয় না। অতএব নিত্যব্যবহার্য বস্তুগুলিকেও নানা রঙে চিত্রবিচিত্র করা হতে থাকে। প্রথম যে

বস্তুটিতে রঙের প্রলেপ পড়ল, তা হল মাটির পাত্র। প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর আগে মাটির পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। সাদামাটা মাটির পাত্রে মানুষের মন ভরেনি। তাকে নানা রঙে চিত্রবিচিত্র করে তুলতে চেয়েছিল সে।



বালি থেকে ইলমেনাইট আহরণ

তারপর বিশুদ্ধ শিল্পের প্রেরণা এল মানুষের মনে। রঙ সম্বন্ধে তার হুঁশ হতেই তার ভেতরকার শিল্পীর সুপ্তিভঙ্গ হল। গুহার শিলাপটে আজও চিহ্নিত আছে আদিম মানুষের আদি চিত্রকলা।

আদিতে যেমন, আজও তেমনি মানুষের চোখ ও মন রঙে মজে আছে। প্রকৃতির নানা রঙের বর্ণালী প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে তার অস্তিত্বের মধ্যে।

প্রাচীনকালে গাছপালা, ফুল ও কয়েকরকম খনিজ পদার্থ থেকে রঙ আহরণ করা হত। আধুনিককালে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম রঙ প্রস্তুত হলেও রঙের উৎস হিসাবে রঙ উৎপাদক খনিজ পদার্থগুলিরও বিশেষ সমাদর আছে।

খনিজদের মধ্যে সবচেয়ে রঙদার হল 'ওকার'। ওকার দুই প্রকারে হয়

থাকে, লাল ও হলদে। লোহা ও অক্সিজেনের যোগে ওকারের উৎপত্তি। লোহার পরিমাণের তারতম্য অনুযায়ী তার রঙ লাল থেকে হলদে হয়ে থাকে।

ভারতে মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থানে ওকারের খনি আছে। এদেশে লাল ও হলদে দুই প্রকার ওকারই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের ওকার বিদেশেও রপ্তানি হয়।

রঙের উৎস হিসেবে ওকারের পরেই 'রুটিল' ও 'ইল্‌মেনাইটের' নাম করতে হয়। রুটিল হল অক্সিজেন-যুক্ত 'টাইটেনিয়াম' এবং ইল্‌মেনাইট টাইটেনিয়াম, লোহা ও অক্সিজেনের যোগফল। রুটিল বা ইলমেনাইটের টাইটেনিয়াম দিয়ে সাদা রঙ তৈরি করা হয়। টাইটেনিয়াম থেকে প্রস্তুত সাদা রঙের শুভ্রতা মনোরম এবং আবরণশক্তি সফেদার চেয়েও বেশি।

ভারত ইল্‌মেনাইটে সমৃদ্ধ। কেরালা ও মাদ্রাজের সমুদ্র-উপকূলে বালির মধ্যে ইল্‌মেনাইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও উড়িষ্যার সমুদ্র-উপকূলের বালির মধ্যে ইল্‌মেনাইট আছে, তবে স্বল্প পরিমাণে। ইল্‌মেনাইটের সঙ্গে রুটিলও পাওয়া যায়। তবে তার পরিমাণ ইল্‌মেনাইটের তুলনায় কম।

ভারতে ইল্‌মেনাইট বা রুটিল থেকে সাদা রঙ তৈরির ক্ষীণ প্রচেষ্টা কেরালার একটি কারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বালি থেকে আহরণ করা ইল্‌মেনাইটের প্রায় সবটাই রপ্তানি করা হয়।

বিদেশে ইল্‌মেনাইট বা রুটিলের সমৃদ্ধি রয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নরওয়ে ও অস্ট্রেলিয়াতে।

সাদা রঙের উৎস হলেও ইল্‌মেনাইটের রঙ কালো এবং রুটিলের রঙ বাদামী। ইল্‌মেনাইট ও রুটিল রঙের জন্য প্রধানতঃ ব্যবহৃত হলেও টাইটেনিয়াম নামক ধাতুর উৎস বলেই তার গুরুত্ব বেশি। কিন্তু টাইটেনিয়াম নিষ্কাশন সহজ নয় বলে রঙের জন্যই তার সমাদর। টাইটেনিয়াম অক্সাইড বা অক্সিজেনযুক্ত টাইটেনিয়াম হল সাদা রঙের উৎস.

সাদা রঙের অন্যান্য উৎস হল ব্যারাইট (baryte) ও টাল্‌ক।

ব্যারাইট অনেকটা শ্বেতপাথরের মত দেখতে, কিন্তু ঈষৎ স্বচ্ছ এবং ভারী। ভারতের অন্ধ্র ব্যারাইটে সমৃদ্ধ। অন্ধ্র ছাড়া রাজস্থান, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্য-

প্রদেশেও ব্যারাইট পাওয়া যায়। ব্যারাইটে সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, মেক্সিকো, কানাডা ও যুগোস্লাভিয়া।

সাদা রঙ তৈরি করতে ব্যারাইট যত না ব্যবহৃত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় খনিজ তেলের জন্য ড্রিলিং-এ। তা ছাড়া, রবার, কাগজ, কাঁচ ও কয়েক রকম রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করতেও ব্যারাইটের প্রয়োজন হয়।

টাল্‌ক বা ষ্টিয়াটাইট খনিজ পদার্থদের মধ্যে কমনীয়তম। রঙে সাদা, স্পর্শে খুব মসৃণ। সাদা রঙ ছাড়া টাল্‌ক দিয়ে তৈরি হয় টাল্‌কাম পাউডার। কাগজ, কাপড় ও রবারেও এর ব্যবহার। ভারতে এই খনিজটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রাজস্থান, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উত্তর প্রদেশে টাল্‌কের ভাণ্ডার আছে। এদেশে উৎপন্ন টাল্‌কের অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বিদেশে জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন টাল্‌কে সমৃদ্ধ।

সাদা রঙ সীসা ও দস্তা থেকেও তৈরি করা হয়। অক্সিজেনের যোগে সীসা ও দস্তা সাদা হয়ে ওঠে। ভারতে সীসা ও দস্তার একমাত্র খনি আছে রাজস্থানের জাওয়ারে, যদিও সীসা ও দস্তাযুক্ত খনিজের ভাণ্ডার রাজস্থানের অন্যান্য অঞ্চল, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পশ্চিম বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে রয়েছে। বিদেশে সীসা ও দস্তাতে বিশেষ সমৃদ্ধ হল অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পেরু ও মেক্সিকো।

অ্যান্টিমনি-যুক্ত খনিজ ষ্টিব্‌নাইটকে চোখের সুর্মা হিসেবে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অধুনা অ্যান্টিমনি থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লাল, হলদে ও সাদা রঙও নিষ্কাশন করা হচ্ছে। ষ্টিব্‌নাইটের কোন খনি এদেশে নেই। ষ্টিব্‌নাইটের ভাণ্ডার অবশ্য হিমাচল প্রদেশ ও মহীশূরে রয়েছে।

চোখে চমক লাগাবার মত রঙের উৎস হল ক্রোমিয়াম। ক্রোমিয়াম শব্দের অর্থই হ'ল রঙের রূপ বা দ্যুতি। ক্রোমিয়াম থেকে সোনালী, কমলা ও হলুদ রঙ তৈরি করা হয়। ক্রোমিয়াম-যুক্ত খনিজ ক্রোমাইটে আমাদের দেশ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। বিহার, উড়িষ্যা ও মহীশূরে ক্রোমাইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বিদেশে ক্রোমাইটে সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেশিয়া, ফিলিপাইন্‌স্ ও তুরস্ক।

আলোক-বিজ্ঞানীদের মতে সব রঙের সমাহার হল কালো রঙ। কালো রঙের জন্য শরণাপন্ন হতে হবে গ্রাফাইট নামক খনিজের। গ্রাফাইট খুব নরম ও মসৃণ—

তাররঙ চিকন কালো। ভারতে গ্র্যাফাইট পাওয়া যায় অন্ধ্র, কেরালা, মহীশূর ও উড়িষ্যাতে। বিদেশে গ্র্যাফাইটে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হল সিংহল, চীন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

কালো রঙের আর একটি উৎস হল ম্যাঙ্গানিজ। অক্সিজেনের যোগে ম্যাঙ্গানিজে গাঢ় কালিমার সঞ্চার হয়। কিন্তু ক্লোরিনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে তার রঙ ব্রোঞ্জের মত হয়ে ওঠে। ম্যাঙ্গানিজ ক্লোরাইড দিয়ে ব্রোঞ্জ রঙে কাপড় ছোপানো হয়। ম্যাঙ্গানিজ-যুক্ত খনিজে পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই।

সিঁদুরে রঙ পাওয়া যায় পারদ থেকে। গন্ধকযুক্ত পারদ হল সিনাবার নামে খনিজ। সিনাবার থেকে সিঁদুর তৈরি হয়। সিঁদুরের ব্যবহার খুবই প্রাচীন। কাঁচের পেছনে সিঁদুরে রঙের প্রলেপ দিয়ে আয়না তৈরি করার কৌশলটাও খুব পুরনো। এদেশে সিনাবারের সন্ধান এ পর্যন্ত মেলেনি। স্পেন, ইটালি ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে সিনাবার পাওয়া যায়।

নিবিড় নীল রঙে রাঙাবার জন্য কোবাল্টের প্রয়োজন। কাঁচে নীলিমা সঞ্চারের জন্য তাতে অল্পবিস্তর কোবাল্ট মেশাতে হয়। রাজস্থানে 'সেহ্‌তা' নামে এক প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, যাতে কোবাল্ট গন্ধক ও অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। সেহ্‌তার রঙ চমকপ্রদ নীল। জয়পুরে মাটি বা ধাতুর পাত্রে নীল রঙের মিনার কাজ করার জন্য সেহ্‌তা ব্যবহার করা হয়। কোবাল্ট একটি দুষ্প্রাপ্য ধাতু। কোবাল্ট উড়িষ্যা ও রাজস্থানে বিভিন্ন খনিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় অবস্থান করছে। কিন্তু তা নিষ্কাশনের কোন আয়োজন এপর্যন্ত করা হয়নি। কঙ্গো, উত্তর রোডেশিয়া, কানাডা, মরক্কো এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কোবাল্টে সমৃদ্ধ।

রঙদার খনিজ পদার্থ সংখ্যায় অনেক হলেও সব রঙ তারা দেয় না। সাদা, কালো, নীল, লাল, হলদে প্রভৃতি কয়েকটি রঙ ছাড়া বাদ বাকি রঙের জন্য কৃত্রিম রাসায়নিক পদ্ধতির শরণাপন্ন হতে হয়।

চোখের তৃপ্তি বা মনোরঞ্জন ছাড়া ক্ষয় প্রতিরোধেও সাহায্য করে রঙ। তাই নিত্য ব্যবহৃত সব বস্তুতেই তার ব্যবহার।

রঙের সংযোগে সাদামাটা জিনিসও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যেখানে সৌন্দর্য-চর্চার অবকাশ নেই, সেখানেও রঙ দেওয়া হয় মন ভোলাবার জন্য।

আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্বে রঙ প্রায় নিঃশ্বাসের বায়ুর মত অপরিহার্য। গৃহসজ্জা থেকে শুরু করে সাজসজ্জা সবেতেই ঠিকমত রঙ বেছে নেবার জন্য মেহনত করতে হয়।

॥ ৬ ॥

লাবণ্য

সমুদ্রে লবণ, মাটিতে লবণ, লবণ চোখের জলে। সহজে লভ্য এবং সুলভ। সবাই এক নজরে চিনি। তা নিয়ে আলোচনা করতে চান?—ভুরু কুঁচকে বললেন শ্রীমতী ল—।

আমি হেসে বললাম, সবার চেনা হলেও সবচেয়ে প্রাচীন। তা ছাড়া মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য।

জটিলতর হয়ে ওঠে শ্রীমতী ল—র ভ্রূকুটি। তিনি বললেন, জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য বলেই আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে পরিহার্য। রান্নাবান্না ও ঘর-কন্না ছাড়া আর কোথাও লবণকে সইতে পারব না।

আমি বললাম, কিন্তু যীশুখৃষ্ট মানুষকে পৃথিবীর লবণ বলে সম্বোধন করেছেন। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে মানুষকে এত বড় মর্যাদা কেউ কখনো দেন নি। প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম ও মধ্য এশিয়ার লোকেরা ভগ-বানকে সম্বোধন করত অন্ন ও লবণদাতা বলে। প্রাচীনকালে লবণের বাণিজ্য চলত ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে। লবণ বোধ হয় মানুষের প্রথম বাণিজ্যপণ্য। লবণ চালান দেওয়ার জন্য প্রাচীনকালে অনেক সড়ক তৈরি করা হয়েছিল। ইটালি, লিবিয়া ও দক্ষিণ রাশিয়াতে অনেক প্রাচীন পথের নিদর্শন আজও দেখা যায়, যে পথ দিয়ে লবণের বাণিজ্য চলত। প্রাচীনকালে লবণ পণ্য হিসেবে খুবই. মূল্যবান ছিল। গান্ধার দেশের বণিকরা কাশ্মীরের দামী নীলার বিনিময়ে লবণ কিনতেন। খাদ্যপ্রাণ না হলেও লবণ খাদ্যের প্রাণ, খাদ্যের আত্মা। প্রতিদিনের ব্যবহারে তার সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য নিষ্প্রভ হলেও লবণ আমাদের জীবন। আমাদের অতিরিক্ত চেনা বলে তাকে চেনার চেষ্টা করি নে। অথচ মামুলী সাদামাটা লবণের মধ্যেও অনেক বিস্ময় আছে। প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে লবণ এত মূল্যবান ছিল যে

প্রাচীন আবিসিনিয়া ও তিব্বতে লবণের চাক্তি দিয়ে মুদ্রার কাজ চালানো হত—রোমান সৈন্যদের মাইনের টাকার সঙ্গে দেওয়া হত লবণ ভাতা।

না, না, লবণ চলবে না।—জোরালো গলায় বলে ওঠেন ল—।—দোহাই আপনাকে, আমাদের সাহিত্যবাসরকে লবণাক্ত করবেন না আপনার প্রবন্ধ দিয়ে।

আমার নামঞ্জুর প্রবন্ধটা আমি পকেটে রেখে দিতে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সকলে মানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন নাগপুরবাসী বাঙালী। মাসে একবার সমবেত হয়ে তাঁরা সাহিত্যালোচনা করেন। আলোচনা সাধারণতঃ সাহিত্যকে উপলক্ষ করে হলেও ব্যাপারটা মূলতঃ আড্ডা। মাঝে মাঝে তাতে গুরুগম্ভীর আলোচনা হলেও মজলিসী গল্পগুজবেই সকলের পক্ষপাত।

আমার 'লবণ' বর্জিত হলে পর আহুত হলেন প্র—তাঁর স্বরচিত রচনা পাঠের জন্য। রচনা তাঁর তৈরি ছিল না, কাজেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন তিনি।

প্র—বললেন, লবণ সম্বন্ধে আপনারা শুনতে চান না—আমিও কিন্তু লবণ সম্বন্ধেই বলব ভেবেছিলাম। লবণ মানে লবণ-পাহাড়। বাইশ বছর আগে পশ্চিম পাঞ্জাবে খেওড়ার লবণ-পাহাড়ে কাজ করতে গিয়ে আমার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। লবণে যখন আপনাদের উৎসাহ নেই, তখন তার কথা হয়তো শুনতে আপনাদের ভাল লাগবে না।

ভাল লাগবে না কেন, নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।—ল—কলস্বরে বলে ওঠেন।—লবণে অরুচি হলেও লবণ-পাহাড়ের গল্পে আপত্তি নেই আমাদের। বলুন না আপনি।

প্র—বলে চলেন:

লবণ-পাহাড়ের গল্প বলার আগে লবণ সম্বন্ধে কিছু বলি। লবণের লাবণ্যের স্বাদ তো আপনারা পেয়েছেন, কিন্তু খনিজ লবণের খবর হয়তো রাখেন না। এদেশে খনিজ লবণ পাওয়া যায় হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডিতে। এখানে মাটির নীচে লবণ গম্বুজের আকারে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। লবণের গম্বুজ তেলের খনিতেও পাওয়া যায়। মাটির নীচে তা পাললিক শিলাস্তরকে ভেদ করে ওঠে। জায়গায় জায়গায় বেলেপাথর, চুনাপাথর বা কাদাপাথরের সঙ্গে লবণের স্তর স্তরীভূত হয়ে থাকে। অবশ্য লবণের প্রধান উৎস হল সমুদ্র ও লবণাক্ত হ্রদ। তাই খনিজ লবণ সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ নেই কারুরই। তথাপি লবণের খনি পৃথিবীর অনেক

জায়গায় আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশ খনিজ লবণে রীতিমত লবণাক্ত।

পশ্চিম পাঞ্জাবের খেওড়াতে লবণ-পাহাড় আছে। সেখানে বেলেপাথর, কাদা-পাথর প্রভৃতি পাললিক শিলার সঙ্গে লবণের স্তর স্তরীভূত হয়ে আছে। জায়গাটি প্রায় বৃষ্টিবিহীন, কাজেই সঞ্চিত লবণের জলে দ্রবণের সম্ভাবনা নেই। লবণ এখানে অবাধে জমে জমে পাহাড়ের আকার নিয়েছে।

জলের অভাবে লবণ জমেছে, কিন্তু মাটি হয়ে উঠছে রিক্ত। জলের অভাব মাটিকে যেমন নিষ্ফলা করেছে, তেমনি লবণও হরণ করেছে মাটির লাবণ্য। লবণ মাটিতে মিশে থেকে মাটির প্রাণশক্তি শুষে নিয়েছে। নির্জলা ও লবণাক্ত অন্তঃসার-শূন্য মাটিতে সবুজের কোন স্বাক্ষর পড়ে নি। জায়গাটা প্রায় মরুভূমির মতই রিক্ত। জায়গায় জায়গায় অবশ্য রিক্ততার বক্ষ ভেদ করে উঠেছে ছোট ছোট কাঁটাঝোপ।

খেওড়ার লবণ-পাহাড়ে খুব প্রাচীন কালের খনির নিদর্শন দেখা যায়। আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাবে পা দিয়ে খেওড়ার লবণের খনির খবর পেয়েছিলেন। লবণ-পাহাড় থেকে তখন প্রচুর পরিমাণে লবণ খুঁড়ে বের করা হত। প্রাচীন খননকে অনুসরণ করে বর্তমান কালের খনিবিদরা খনিত্র চালনা করেছেন।

খনির ইতিহাস খুব পুরনো হলেও লবণ-পাহাড়ের লবণের ভাণ্ডারের পুরো খবর নেওয়া হয়ে ওঠে নি। তাই ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল এবং আমাকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে। লবণ-পাহাড়ের যে অংশে প্রাচীন বা আধুনিক খনির কোন চিহ্ন নেই, প্রথমে সেখানে গেলাম। জায়গাটি নির্জন, কাছাকাছি কোন লোকালয় নেই। লোকজনের কোন স্থায়ী বসতি না থাকলেও অবশ্য যাযাবর শ্রেণীর কিছু লোক সেখানে অস্থায়ীভাবে তাঁবু খাটিয়ে বাস করছিল। তাদেরএকটি শিবিরের কাছে আমি আমার তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প করলাম।

আমার কার্যকলাপ দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠে যাযাবরের দল। সুদূর বাংলা-দেশ থেকে লবণের মত সাদামাটা জিনিস খুঁজতে এসেছি জেনে রীতিমত কৌতুক বোধ করে তারা। লবণ তাদের কাছে সাদা মাটি ছাড়া কিছু নয়। খাদ্যদ্রব্যে লবণ দেওয়া তাদের কাছে বন্যতার সামিল। লবণ সম্পর্কে তাদের মনে কিছু বদ্ধমূল সংস্কারও আছে। লবণ খেলে নাকি লবণের মর্যাদা রাখতে মাটির সঙ্গে

সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। কারুর দেওয়া লবণ খেলেই নাকি তার সঙ্গে সম্পর্ক পাকা করে তোলা হয়। সে সম্পর্ক সহজ সখ্যতার নয়, দায়িত্বের। কাজেই তাদের খাদ্য তালিকা থেকে লবণ বাদ পড়েছে। তাদের প্রধান খাদ্য হল মাংস ও ফলমূল, প্রধান পানীয় দুধ। মাংস ঝলসে তারা লবণ ছাড়াই খায়।

যাযাবর শ্রেণীর অনেক জাতের মধ্যেই লবণের চলন নেই। আরবের কোন কোন বেদুইন সম্প্রদায় সম্প্রতি লবণ খেতে শুরু করেছে। কয়েকটি প্রাচীন উপজাতিও এতকাল লবণ স্পর্শ করে নি। তাদের মধ্যে আছে দক্ষিণ ভারতের টোডা সম্প্রদায়। হালে তারা লবণ পাতে নিয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন যে, কৃষির সঙ্গে লবণের ব্যবহারের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। কৃষিজাত শস্য কাঁচা খাওয়া যায় না, রান্না করে খেতে হয়। রান্না করা শস্যজাত খাদ্যে লবণের পরিমাণ এতই কম যে তাতে লবণ না মেশালে তা মুখেই দেওয়া যায় না। অথচ পশুর দেহে লবণ থাকে যথেষ্ট পরিমাণে। মাংস ঝলসে খেলেও তাতে লবণের স্বাদ পাওয়া যায়। অতএব কৃষিই লবণকে আকর্ষণ করেছে মানুষের খাদ্য তালিকায়। কৃষির সঙ্গে যাযাবরদের কোন সম্পর্ক নেই, কাজেই লবণ সম্বন্ধে তারা স্পর্শকাতর।

॥ ৭ ॥

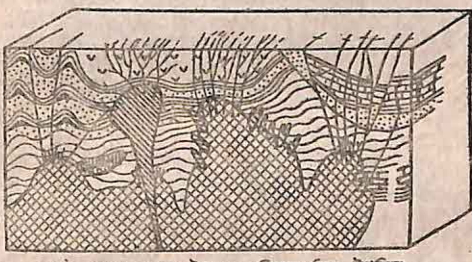
স্বর্ণস্নান

সিংভূম জেলার গালুডিতে ক্যাম্প করে সুবর্ণরেখা নদীর দুধারে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় ব্যস্ত ছিলাম। পাথরের স্তরে স্তরে সন্ধানী দৃষ্টিপাত করলেও নির্দিষ্ট কোনও খনিজ খুঁজছিলাম না। পাথর পরখ করছিলাম বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তালাসের জন্য।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাজের শেষে তাঁবুর সামনে ডেক চেয়ার পেতে বসে আছি, এমন সময় একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের যুবক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। যুবকটির পরনে একটি ছেঁড়া ময়লা সুট। কিন্তু পোষাকের ম্লানতা তার চোখের দীপ্তিকে নিষ্প্রভ করতে পারে নি। তার চোখ দুটি সর্বদাই জ্বল জ্বল করে ভেতরের দাহকে প্রকাশ করছে।

আমার সামনে একটি ফাঁকা চেয়ার ছিল। তাতে বসে পড়ে সে বললে, আমার নাম প্রবীর পাল। আপাততঃ গালুডিতে আছি। শুনলাম এখানে আপনি জিয়োলজিক্যাল সারভে করছেন। আমি নিজে জিয়োলজিস্ট না হলেও জিয়োলজির প্রতি আমার বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। জিয়োলজিস্টরা জিয়োলজি করতে করতে জুয়েলের সন্ধান পেয়ে যান। অবশ্য জুয়েলের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। আমি চাই সোনা। প্রচুর পরিমাণ সোনা। বলুন দিকিনি এ অঞ্চলে সোনার খোঁজ কিছু পেলেন কী।

বলতে বলতে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রবীর পাল। তার জ্বলন্ত চোখ দুটির তাপমাত্রা হঠাৎ যেন বেড়ে গেল। আমি কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করি। তার দৃষ্টি এড়াবার জন্য মুখ নীচু করে আমি বললাম, সোনা তো পাই নি কোথাও। শোনা যায় সোনা সুবর্ণরেখা নদীর বালির মধ্যে আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নি।



ভূগর্ভস্থ ম্যাগমা থেকে উদ্‌গত খনিজের শিরা উপশিরা

ম্যাগমা — ম্যাগমা থেকে নির্গত খনিজের আধার
শিলাস্তর — খনিজের ভাণ্ডার
খনিজের শিরা উপশিরা — মাটির স্তর

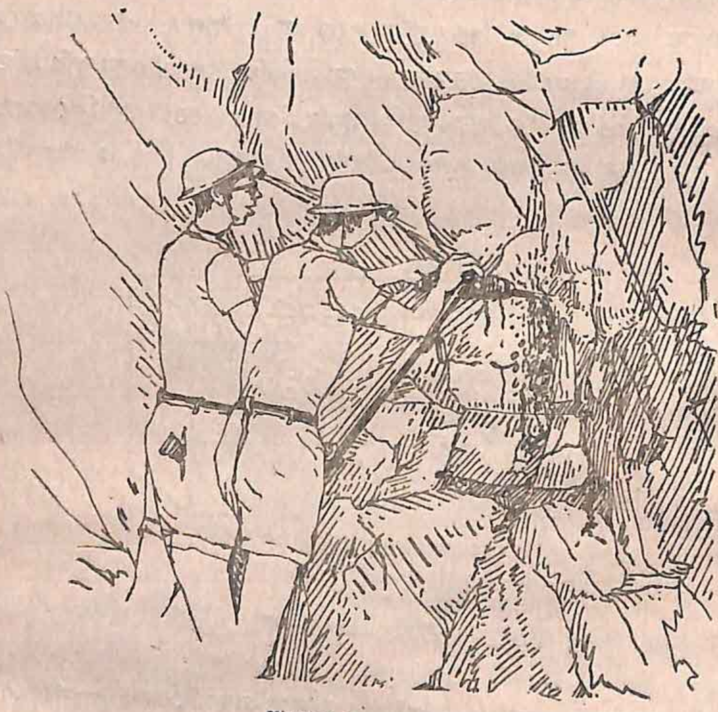
চোখে পড়ে নি মানে। —প্রবীরের কণ্ঠস্বরে প্রবল উত্তেজনা।—এত সোনা কোথায় গেল বলতে পারেন? পাঁচ হাজার বছর ধরে লাখ লাখ টন সোনা মানুষ খনি থেকে খুঁড়ে বের করেছে। জানেন নিশ্চয়ই যে সোনার ক্ষয় নেই। যা অক্ষয়, তা নিশ্চয়ই উবে যেতে পারে না। তাছাড়া মানুষের কাছে সোনা চিরকালই মূল্যবান। এমন মূল্যবান জিনিস সে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করবে এইটেই তো স্বাভাবিক। তা হলে পৃথিবীর সব সোনা কোথায় গেল বলতে পারেন?

উত্তেজনায় প্রবীরের সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে।

প্রবীরের মুখের পানে চেয়ে দেখি যে অস্বাভাবিক রকম তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে।

আমার সন্দেহ হল বুঝি তার মস্তিষ্ক পুরোপুরি সুস্থ নয়।

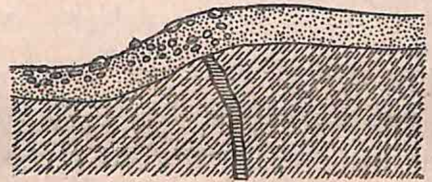
আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রবীর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে, কী মশাই, চুপ করে আছেন কেন? জবাব দিন।



পাথরের স্তরে খনন

আমতা আমতা করে আমি জবাব দিলাম, কী আর জবাব দেব বলুন! এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ আমি। আপনি বরং একটা কাজ করুন। পৃথিবীর কোথায় কত সোনা থাকা উচিত ছিল এবং কত আছে তার হিসেব করুন। তারপর দেখুন সত্যি সত্যি কত সোনা হারিয়ে গেছে। তার পরিমাণ ঠিক করে এই হারানো সোনার সন্ধান নিন।

প্রবীরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। হাসিটা নীরব, কিন্তু বিশেষ অর্থবহ হাসতে হাসতে বললে সে, হিসেব কী নিই নি ভেবেছেন! বিস্তর বইপত্র ঘেঁটে মোটামুটি একটা হিসেব আমি দাঁড় করিয়েছি। আপনার বোধহয় জানা আছে, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সোনা খুবই প্রাচীন। ধাতুদের মধ্যে সর্বপ্রথম সোনাই মানুষের নজরে এসেছে; নয়া প্রস্তর যুগে, মানে তামা আবিষ্কার হওয়ার অনেক আগে নদীর বালির মধ্যে সোনার সন্ধান পেয়েছে মানুষ। ঐতিহাসিকদের হিসেবে সে প্রায় সাত হাজার বছর আগেকার কথা। তখন নদীর বালিতে অনেক সোনা ছিল। বালির দিকে তাকালেই সোনা চোখে পড়ত। তখন সুবর্ণরেখা নদীর বালিতেও নিশ্চয়ই প্রচুর সোনা ছিল। বালিতে সোনার প্রাচুর্য দেখেই বোধহয় সুবর্ণরেখা নাম দেওয়া হয়েছিল।



ভূগর্ভে সোনা যুক্ত কোয়ার্ট্‌জ এর শিরা

কোয়ার্ট্‌জ এর শিরা — মাইকাসিষ্ট পাথরের স্তর — মাটির আবরণ

বস্তুজগতে সোনা একমাত্র জিনিস যা মানুষের দৃষ্টিতে আসামাত্র তার মন জয় করে নিয়েছিল। আদিম মানুষের সৌন্দর্যবোধ বিকশিত না হলেও সোনার সৌন্দর্যে তার মন মজেছিল। তাছাড়া বস্তু হিসেবে সোনার যে ক্ষয় নেই, সোনাকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল। আদিম মানুষের রুচি যতই স্থূল হোক না কেন, স্বর্ণসজ্জায় নিজেদের দেহ মণ্ডিত করে মন তাদের তৃপ্ত হয়েছে। আদিমতমা থেকে শুরু করে আধুনিকতমা পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশের সব মেয়ের মধ্যে সোনা সম্পর্কে সমান পক্ষপাত দেখা গেছে। সোনা ভালবাসে না এমন নারীর কথা কোথাও শোনা যায় নি।

বস্তুজগতে সোনাই একমাত্র বস্তু যা গোড়া থেকেই তার যথাযোগ্য মূল্য পেয়েছে। যুগে যুগে অন্যান্য বিষয়ে মানুষের মূল্যবোধ বদলালেও সোনার মূল্যমানের কোন পরিবর্তন কখনো ঘটে নি। মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তা এখন

বস্তুর সীমা পেরিয়ে বস্তুর অতীতে উপনীত হয়েছে, কিন্তু সোনা সম্পর্কে মানুষের সংস্কারের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। সভ্যতার প্রথম প্রহর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষ স্বর্ণ-মানকে মেনে নিয়েছে।

সোনা মানেই সমৃদ্ধি। সোনার পরিমাণে সম্পদের পরিমাপ। কাজেই সোনা সঞ্চয়ের ঝোঁক মানুষের মধ্যে সহজাত। আদিম আদমি থেকে শুরু করে আধুনিক ধনিক ও নির্ধন সকলেই সোনা সঞ্চয় করে সমৃদ্ধ হতে চেয়েছে।

আদিম সভ্যতাগুলির প্রায় সবই সোনায় মোড়া। সুদূর অতীতের বড় বড় সাম্রাজ্যগুলির সমৃদ্ধির পরিমাপ করা যায় তাদের স্বর্ণভাণ্ডার থেকে। প্রাচীন কালে দেবস্থানেও সোনা উৎসর্গ করার প্রথা ছিল। অনেক পুরনো মন্দিরে প্রচুর পরিমাণে সোনা মজুত ছিল। ভারতবর্ষের অনেক দেবালয়েও সোনার ভাণ্ডার আছে।

প্রাচীন মানুষের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে সোনা সম্পর্কে মানুষের আসক্তি মরলেও যায় না। তাই মৃতদেহের সঙ্গে সোনা সমাধিস্থ করার প্রথা ছিল। মিশরের ফারাওদের সমাধিস্থলে প্রচুর পরিমাণে সোনা পাওয়া গিয়েছে। প্রায় তিন হাজার সাড়ে তিনশ বছর আগে মিশরের ফারাও ছিলেন টুটেনখামেন। অপরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর কবরের মধ্যে শবাধারে প্রায় দুশ হন্দর সোনা পাওয়া গিয়েছে।

প্রথম সোনা বের করা হয়েছিল নদীর বালি থেকে। তারপর শিলাস্তরে প্রচ্ছন্ন স্বর্ণভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে মানুষ। সোনার প্রথম খনির পত্তন হয়েছিল মিশরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। নদীর বালি ও সোনার খনি থেকে অনেক সোনা তোলা হয়েছে। রাজা-রাজড়াদের স্বর্ণভাণ্ডার ও সমাধি এবং দেবালয়ে অনেক সোনা মজুত ছিল। হিসেব করলে মোট সোনার সঞ্চয়ের খুব মোটা একটা অঙ্ক পাওয়া যায়। কিন্তু এই অঙ্কের সঙ্গে পৃথিবীশুদ্ধ মোট যে সোনা আছে তার পরিমাণ আদৌ মেলে না। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে সঞ্চিত সোনার অধিকাংশ হারিয়ে গেছে।

মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল। আজকে যাকে মূল্যবান ব'লে জানি, পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল হয়তো তার কোন দামই থাকবে না। মানুষ তাই এমন কিছুর সন্ধান ক'রে এসেছে, যা কখনো মূল্যহীন হয় না।

বস্তুজগতে এমন কিছু নেই, যাকে নির্দিষ্ট মূল্য দিয়ে বাঁধা যায়। উৎপাদন, ব্যবহারিক প্রয়োজন, অর্থনৈতিক পরিবেশ, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে যে কোনও জিনিসের দাম। মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী শর্তগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দামের ওঠা-নামা চলে।

মূল্য বদলের পালার সঙ্গে তাল রাখতে হিমসিম খায় যে-কোনও দেশের অর্থ-নীতি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনার জন্য তাই প্রয়োজন হয় এমন একটি জিনিসের, যে-কোনও পরিবেশ বা সমাজব্যবস্থার মধ্যে যার মূল্যমান একটা নির্দিষ্ট মাত্রার নীচে কখনই নামবে না। সভ্যতার প্রথম প্রহর থেকেই এমন একটি জিনিসের সন্ধান পেয়ে গেছে মানুষ, যার দাম কখনও কোন অবস্থাতেই তার উচিত মূল্যমান থেকে নেমে আসেনি। সভ্যতার ক্রমবিকাশের যে কোনও ধাপের মধ্যে তার নির্দিষ্ট জায়গা করে নিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে পৃথিবীর যে-কোনও দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই জিনিসটি হ'ল সোনা।

পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা বিনাশের অতীত। কিন্তু সোনা এমন একটি জিনিস যা সাধারণ ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে অবিনশ্বর। মিশরের পিরামিড ও মহেঞ্জোদারো থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেকার সোনার মুদ্রা ও অলঙ্কার অটুট ও অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পাঁচ হাজার বছর আগে যেমন ছিল, তেমনই আছে। প্রাক্তন জৌলুস হাজার হাজার বছরের ব্যবধানেও এতটুকু নিষ্প্রভ হয়নি।

ধাতুদের মধ্যে সোনার বিশেষত্ব হ'ল তার ক্ষয়হীন স্থায়িত্ব ও অপরূপ সোনালী উজ্জ্বলতা। রবীন্দ্রনাথ সোনাকে বর্ণনা করেছেন, সূর্যের জমাট বাঁধা আলোকপুঞ্জ বলে, যার চির-অম্লান দীপ্তি যেন কঠিন হয়ে স্থির হয়ে আছে।

সোনার বিশেষত্ব কেবলমাত্র বাইরের চোখে চমক লাগাবার মত দীপ্তিতেই নয়, তার অন্তর্নিহিত দ্রব্যগুণেও। ধাতুদের মধ্যে সেরা ধাতু হ'ল সোনা। 'একুয়া রেজিয়ার' মত জোরালো এ্যাসিড ছাড়া অন্য কোনও রাসায়নিক পদার্থের সাধ্য নেই যে এই ধাতুটিকে দ্রবীভূত করে। তা ছাড়া সোনার মত নমনীয়তা ও কমনীয়তা অন্য কোনও ধাতুর নেই। সোনাকে ইচ্ছে মত যে-কোনও আকার দেওয়া যায়, নানা দেশের অলঙ্কারের বিচিত্র কারুকার্যের মধ্যে যার প্রমাণ রয়েছে। সোনার পাত রেশমী কাপড়ের সূক্ষ্মতাকেও হার মানাতে পারে। সোনার তারকে ইচ্ছে করলে সুতোর চেয়েও সূক্ষ্ম করে তোলা যায়।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই সোনাকে তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়েছে মানুষ—সোনার বৈশিষ্ট্যকে চিনে নিয়ে দৈনন্দিন ব্যবহারের উর্ধ্বে তাকে বিশেষ জায়গা দিয়েছে। সভ্যতা এগিয়েছে তার বিভিন্ন ক্রমগুলি অতিক্রম করে—সমাজব্যবস্থা বদলেছে, মানুষ বদলেছে—পৃথিবীর চেহারা গেছে পাল্টে—এসেছে যন্ত্রযুগ—অণু-পরমাণুর অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তিকে উদ্‌ঘাটন করে সৃষ্টির মূলতত্ত্বের কাছাকাছি পৌঁছাবার আয়োজন চলেছে—পৃথিবী পেরিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যভেদের চূড়ান্ত আয়োজন হচ্ছে—কিন্তু সভ্যতার প্রথম প্রহরে সোনা যে স্বীকৃতি পেয়েছিল, তা আজও অবিচলিত।

সোনার ব্যবহার শুরু হয়েছিল তাম্রযুগ থেকে। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে মিশর ও ব্যাবিলনে। ভারতবর্ষে মহেঞ্জোদারোতে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যবহার করা সোনার অলঙ্কার ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া গিয়াছে।

সোনাকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহারও খুব প্রাচীন কাল থেকেই হচ্ছে। খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে সোনার মুদ্রা ব্যবহারের প্রমাণ আছে। সোনার মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যব্যাপারে স্বর্ণমানের প্রবর্তন হ'ল। এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে না চললেও সোনা দিয়ে বেচাকেনা সুদূর অতীত থেকেই চলে আসছে।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়েছিল। সেই সমৃদ্ধিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল সোনার প্রাচুর্য। বিদেশীরা ভারতবর্ষকে স্বর্ণমণ্ডিত বলে জানতেন। মধ্যযুগে মোগল বাদশাদের সোনার সঞ্চয় সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী রচনা পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ফরাসীদের এদেশের দিকে টেনে এনেছিল।

মহাভারতের সভাপর্বে স্বর্ণমণ্ডিত যজ্ঞসভার বর্ণনা আছে। এই সোনার অধিকাংশ আসামের লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদের উপকূল থেকে আনানো হয়েছিল। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পর্যটক টাভার্নিয়ে আসামে সোনার প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, এশিয়ার আর কোথাও এত সোনা উৎপন্ন হয় না। আসামের রাজার বিপুল স্বর্ণভাণ্ডারও তাঁর নজরে এসেছিল।

আসামের স্বর্ণভাণ্ডার সঞ্চিত ছিল উত্তর-পূর্ব আসামে (বর্তমান নেফা) ডিহিং, জংলু পানি, ব্রহ্মপুত্র, সুবর্ণশ্রী, দেসোই প্রভৃতি নদীর বালির মধ্যে। এই সব নদীর বালি ধুয়ে যারা সোনা আহরণ করত, তারা 'সোনওয়াল' নামে পরিচিত ছিল। মোগল বাদশা ঔরংজেবের আমলে বার থেকে কুড়ি হাজার সোনওয়াল

এই কাজে নিযুক্ত ছিল। এই নিয়োগ ছিল বাধ্যতা মূলক। আসামের রাজাকে রাজকর হিসেবে বার্ষিক এক তোলা করে সোনা দিতে বাধ্য ছিল প্রত্যেক সোনওয়াল।

প্রায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় আসামের সোনওয়ালরা নদীর বালি ধুয়ে সোনা আহরণ করত। বালির মধ্যে প্রথমে ছোট ছোট নালা খুঁড়ে বালি ধুয়ে সোনার দানাগুলিকে ঘনীভূত করে তোলা হ'ত। তারপর 'দরুনি' নামে পাত্রে দ্বিতীয়বার ধোয়ার পালা চলত। অবশেষে পারদ দিয়ে সোনার কণাগুলোকে শুষে তোলা হ'ত। সোনাযুক্ত পারদ গরম করলে পারদ উবে গিয়ে সোনা থাকত অবশিষ্ট।

উত্তর-পূর্ব আসামের নদীগুলোর বালি থেকে সোনা তোলার পালা বহু শতাব্দী ধরে চলে বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে শেষ হয়ে গেছে। বালির মধ্যে সোনার পরিমাণ কমে আসাই শুধু এর কারণ নয়। প্রধান কারণ হ'ল, 'সোনওয়ালদের' ওপর থেকে বাধ্যতামূলক আইনের প্রত্যাহার। বাধ্যতামূলক ভাবে সোনা আহরণ করে মাথাপিছু এক তোলা করে রাজকর দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে 'সোনওয়ালরা' সোনা তোলা ছেড়ে দিল। রাজসূয় যজ্ঞের সোনার সমারোহ ও ফরাসী পর্যটক টাভার্নিয়ের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া স্বুবর্ণমণ্ডিত সমৃদ্ধি বেগার-খাটা সোনওয়ালদের গায়ের রক্ত জল করে আদায় করা হয়েছিল।

আসামের মত দক্ষিণ ভারতেও সুদূর অতীত থেকে সোনার উৎপাদন চলত। তবে আসামের মত সোনা উৎপাদনের পালা এখানে শেষ হয়ে যায়নি। মহীশূরের অন্তর্গত 'হাটি' ও 'কোলারের' সোনার খনি থেকে বছরে এখনো প্রায় পাঁচ হাজার কিলোগ্রাম করে সোনা উৎপাদিত হয়।

মহীশূরের সোনাখনি অঞ্চলে সোনাবাহী কোয়ার্টজ্ নামে খনিজের প্রতিটি শিরা-উপশিরা থেকে যে সোনা তোলার চেষ্টা সুদূর প্রাচীন কালে হয়েছে, তার প্রমাণ আছে। প্রাচীন খনিগুলোর আশে-পাশে পাথর ও লোহার তৈরী যে সব হাতুড়ি, ছেনি ইত্যাদি পাওয়া গেছে, প্রত্নতাত্ত্বিকরা সেগুলো পরীক্ষা করে বলেছেন যে প্রায় ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল। কাজেই সোনার খনিগুলোর ইতিহাসকে ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত করা চলে।

মহীশূরের অন্তর্গত রাইচুর জেলায় 'হাটির' সোনাখনি অঞ্চলে কয়েকটি প্রাচীন খনির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। মাটির নীচে ৬৪০ ফুট পর্যন্ত গভীর ছিল এই

খনিগুলো। প্রায় আধুনিক খনিবিজ্ঞানসম্মত প্রথায় খনিগুলোতে কাজ করা হ'ত। সোনাযুক্ত খনিজের শিরাগুলি বেয়ে খনন করা সুড়ঙ্গ পথগুলিতে ধস-প্রতিরোধক কাঠের তক্তা বসানো হ'ত আধুনিক খনি বিজ্ঞানের অনুসরণে। সোনাযুক্ত কোয়ার্টজ খুঁড়ে বের করে অতিকায় গ্রানাইট পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হ'ত। তারপর কাঠের পাত্রে জল দিয়ে ধুয়ে সোনার দানাকে কোয়ার্টজের কণা থেকে তফাৎ করা হ'ত। কোয়ার্টজ ধুয়ে অপসারিত হ'য়ে সোনার পরিমাণ বেড়ে গেলে পারদ ঘষে সোনার কণাগুলোকে আহরণ করা হ'ত।

হাটির সোনাখনি অঞ্চলে 'মশি' নামে একটি গ্রামে কিছু প্রাচীন ইঁটের টুকরা, মাটির পাত্রের ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল। এগুলি দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন যে, এখানেই সম্রাট অশোকের দাক্ষিণাত্যের রাজধানী স্বর্ণনগরী অবস্থিত ছিল। তাঁদের অনুমানের আনুকূল্য করছে অদূরবর্তী প্রাচীন সোনার খনি, সোনাযুক্ত খনিজ থেকে সোনা-নিষ্কাশনের আয়োজনের অবশেষ।

দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার অন্তর্গত রোডেশিয়ার প্রাচীন সোনার খনিগুলির মধ্যে দক্ষিণ ভারতের সোনাখনি অঞ্চলের প্রাচীন খননপদ্ধতির বিস্ময়কর প্রভাব দেখা যায়। রোডেশিয়ার প্রাচীন সোনার খনিগুলোর আশেপাশে ভারতীয় কার্পাস, তেঁতুল প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভারতীয় ধাঁচের গাছপালা জন্মাতে দেখা গেছে। স্থানীয় উদ্ভিদ শ্রেণীর সঙ্গে তাদের মূলগত পার্থক্য থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে উদ্ভিদতত্ত্ববিদরাও বলেন যে, ভারতবর্ষ থেকে এদের আমদানি করা হয়েছে। রোডেশিয়ার সোনাখনি অঞ্চলের মধ্যে গাছগুলির সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন কালে দক্ষিণ ভারতীয় স্বর্ণখনিবিদরা রোডেশিয়ায় গিয়ে সেখানকার সোনার খনিতে কাজ করতেন। তাঁরাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য তেঁতুল প্রভৃতি গাছের বীজ ও চারা। দক্ষিণ ভারতীয়দের সঙ্গে রোডেশিয়ানদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের প্রভাব রয়ে গেছে দক্ষিণ ভারতীয়দের আর্যসংস্কার বহির্ভূত আচার ব্যবহারের মধ্যে।

হাটির প্রাচীন সোনার খনি মাটির নীচে ৬৪০ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খনির গর্ভে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ তখন ছিল কল্পনাতীত। যখন খনিবিদদের একমাত্র সম্বল ছিল লোহা ও পাথরের তৈরি সামান্য যন্ত্রপাতি ও বাহুবল, তখন মাটির ৬৪০ ফুট নীচে কী রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রাচীন খনি শ্রমিকরা কাজ করত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

৬৪০ ফুট নীচে প্রচণ্ড উত্তাপ ও অবরুদ্ধ বাতাসের মধ্যে প্রায় সুনিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানার মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়িয়ে কাজ করত তারা। প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন যে, ক্রীতদাসদের নিয়োগ করা হ'ত খনিতে কাজ করবার জন্য। মাটির ভেতরকার গুপ্ত ঐশ্বর্য সংগ্রহ করা হ'ত তাদের প্রাণের বিনিময়ে।

আসাম ও দক্ষিণ ভারত ছাড়া ছোটনাগপুর অঞ্চলে কিছু কিছু সোনা তোলা হ'ত নদীর বালি ও খনি থেকে। যশপুর, পোরহাট, গাঙ্গপুর, রাজবাসা, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলে পুরোনো সোনার খনির চিহ্ন রয়েছে। সুবর্ণরেখা নদীর বালি ও ধলভূমের বিস্তীর্ণ খোয়াইগুলো থেকেও সোনা আহরণ করার আয়োজন ছিল। ধলভূমের ক্ষয়ে যাওয়া উষর মাটি ও সুবর্ণরেখার বালিতে সোনার রেখা আজও দেখা যায়। সোনার দরুণ এ দেশে যে সমৃদ্ধি ছিল তা আপাততঃ স্তিমিত হয়ে পড়লেও তার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তার প্রথম কারণ সোনার অতিমাত্রায় মূল্য বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় কারণ আকর থেকে সোনা নিষ্কাশনের উন্নততর পদ্ধতি। এ দেশের সব কটি স্বর্ণভাণ্ডারের দিকে প্রাচীন ভারতীয় খনিবিদ্‌দের নজর পড়েছিল, কাজেই প্রাক্তন স্বর্ণসমৃদ্ধিকে পুনরুদ্ধার করতে হলে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে প্রাচীন সোনার খনির অবশেষগুলোর মধ্যে। প্রাক্তন সমৃদ্ধির অবশেষই যে শেষ নয় তা প্রমাণ করব আমরা পরিত্যক্ত সোনার খনিগুলোকে পুনরুদ্ধার করে। "সোনার দেশ" যে সত্যিই সোনার দেশ, এদেশের স্বর্ণমণ্ডিত ভবিষ্যৎ তা প্রকাশ করবে।

॥ ৮ ॥

রূপসী রূপা

রূপ থেকেই বোধ হয় রূপা। এমন সুন্দর ধাতু আর হয় না। প্রাচীন কালের মানুষেরা রূপার শুভ্রতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রাচীন মিশরীয়রা রূপাকে বলতেন সাদা সোনা। রূপা অবশ্য সোনার সঙ্গেও মেশানো থাকে। সোনা মেশানো রূপা প্রাচীনকালে ল্যাটিন ভাষায় 'ইলেকট্রাম' নামে পরিচিত ছিল।

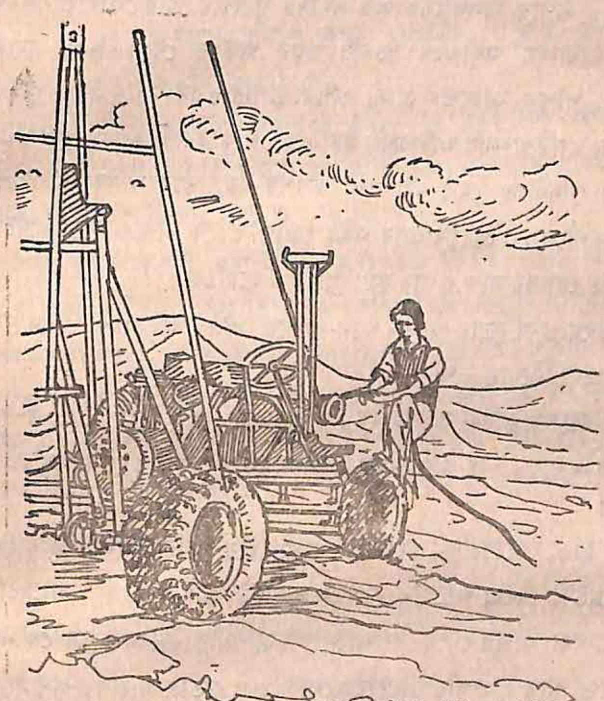
ইলেকট্রামের বিশেষ সমাদর ছিল প্রাচীন উর, সুমের, মহেঞ্জোদরো প্রভৃতি দেশে কিন্তু প্রাচীনকালে ইলেকট্রাম বিশেষভাবে সমাদৃত হলেও রূপার আবিষ্কার ইলেকট্রামের আগেই হয়েছিল। প্রায় ছ হাজার বছর আগে রূপাকে তার মৌলিক ধাতুগত অবস্থাতে আবিষ্কার করা হয়েছিল। বালিতে বা পাথরে রূপার শুভ্র ধাতুরূপ সকলকে মুগ্ধ করেছিল এবং সোনার মত রূপাও অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। রূপার পরে ইলেকট্রাম আবিষ্কৃত হল। রূপা ও ইলেকট্রাম দুয়েরই খুব সমাদর ছিল। কিন্তু মৌলিক ধাতুরূপে তাদের এত অল্প পাওয়া যেত যে, তারা কালক্রমে রীতিমত দুর্লভ হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে সীসাযুক্ত গ্যালেনা থেকে রূপা নিষ্কাশনের কৌশল আবিষ্কৃত হল। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে পণ্টাস নামে একটি জায়গার কাছে একটি সম্প্রদায় থাকত, যাদের পেশা ছিল পাথর গলিয়ে ধাতু নিষ্কাশন করা। সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়টিই গ্যালেনা থেকে রূপা বের করার কৌশলটি আবিষ্কার করে। গ্যালেনাকে আগুনে দিলে তা অল্প তাপেই গলে সীসায় পরিণত হয়। পণ্টাসের কামাররা এইভাবে প্রচুর পরিমাণে সীসা উৎপাদন করত। চুল্লীর তাপ বেশি হলে সীসা পুড়ে ছাই হত। সীসার ছাইয়ের মধ্যে হঠাৎ একদিন কামাররা আবিষ্কার করল যে একটি রূপালী ধাতুর কণা চিক চিক করছে। তারা বুঝতে পারল যে, সীসা পুড়ে ছাই হতে সীসার বাঁধন থেকে রূপালী ধাতুটির মুক্তি ঘটেছে। এই ধাতুটিই রূপা। সীসার পুড়ে ছাই হওয়াটাই অনেকটা শাপে বর হয়ে দাঁড়াল। এর পর প্রচুর পরিমাণে সীসা পুড়িয়ে রূপা নিষ্কাশন করা হতে থাকে।

প্রাচীন রোম দেশে রোমানরা যখন প্রথম রূপার সঙ্গে পরিচিত হল, তারা তার নাম দিল "Luna"—অর্থাৎ চাঁদ। রূপার বর্ণনায় তারা চাঁদকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করত। চাঁদের স্নিগ্ধ শুভ্রতাকে তারা রূপার মধ্যে প্রতিফলিত দেখেছে।

যা কিছু শুভ্র, যা কিছু নির্মল, রূপার সঙ্গে সার্থকভাবে তার উপমা দেওয়া হয় পৃথিবীর যে কোনও দেশের সাহিত্যে। রূপা নামে ধাতুটি তার বস্তু-সীমা অতিক্রম করে গেছে কবির কল্পনাক্ষেত্রে।

ধাতুদের মধ্যে শুভ্রতম রূপা। তার অপরূপ রূপ সহজ স্বীকৃতি পেয়েছে সর্বসাধারণের মধ্যে। সোনার জৌলুস সাধারণ লোকদের চোখ ধাঁধায়, কিন্তু

রূপার স্নিগ্ধ শুভ্র কান্তি তাদের মন ভোলায়। দুর্লভ ও দুর্মূল্য বলে সোনা রয়ে গেছে সাধারণের নাগালের বাইরে—রূপাকে সবাই পেয়েছে তাদের সহজ আয়ত্তের মধ্যে।



খনিজের খোঁজে ড্রিলিং

রূপা জনপ্রিয় ধাতু। অলঙ্কার হিসাবে সর্বত্র এর বহুল ও ব্যাপক ব্যবহার। রূপার তৈজসের সমাদরও বিশ্বময় ব্যাপ্ত। প্রাচীনকালে রূপার ব্যবহার প্রধানত তৈজস হিসেবেই হত। মিশর, গ্রীস, রোম, পারস্য, চীন ও ভারতবর্ষে প্রাচীন তৈজসের বহুবিধ নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে য়ুরোপে রৌপ্যশিল্পের বিশেষ সমাদর ছিল। রৌপ্যশিল্পীদের চিত্রকর ও ভাস্করদের চেয়েও উঁচু দরের শিল্পী বলে মনে করা হত।

ভারতীয় রৌপ্য-শিল্পের নিদর্শন রয়ে গেছে প্রাচীন মন্দিরগুলোতে। বৃটিশ

মিউজিয়ামে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে নির্মিত একটি কুবেরের মূর্তি উৎকীর্ণ করা অপরূপ রূপার পাত্র সংরক্ষিত রয়েছে।

রূপার তৈজসের চেয়ে রূপার অলঙ্কারের প্রতিই ভারতীয়দের অধিক পক্ষপাত। রূপার অলঙ্কারের এত সমাদর পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভবত নেই। ভারতীয় নারীদের অঙ্গাভরণ রচনায় সুদূর অতীত থেকে রূপা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পশ্চিম ভারতের গ্রাম্য রমণীরা রূপার শুভ্রতা দিয়ে সর্বাঙ্গ ভূষিত করার জন্য ওজনে ভারি গহনায় ভারাক্রান্ত হবার কষ্ট স্বীকার করতেও উৎসুক।

অধুনা পৃথিবীতে মোট যত রূপা উৎপন্ন হয়, তার অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে টাঁকশালে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় অষ্টম শতাব্দী থেকে নীল ও সিন্ধু নদের মধ্যবর্তী দেশগুলিতে সোনার সঙ্গে রূপার মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল।

কালক্রমে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন কমে এসেছে এবং অধিকাংশ দেশের টাঁকশালে সোনার জায়গা নিয়েছে রূপা।

ওষুধ-বিষুধেও রূপার ব্যবহার হয়। ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রে রূপার নানা-বিধ গুণ স্বীকৃত। আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানসম্মত কয়েকটি ওষুধের অন্যতর উপকরণ হল রূপা।

রূপা ছাড়া ফটোগ্রাফী হয় না। রূপা দিয়ে তৈরি সিলভার ব্রোমাইড ফটো-গ্রাফের প্লেট বা ফিল্মে আলোক-সচেতন শুভ্র পট রচনা করে। ক্যামেরার কালো আধারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে তা আলোকচিত্রশিল্পীর ইচ্ছামত যে কোনও দৃশ্যকে ধরে রাখতে পারে। রূপার শুভ্রতার মধ্যে রয়েছে সুতীব্র আলোকস্পর্শ সচেতনতা। আলোর সূক্ষ্মতম স্পর্শও তাকে বিচলিত করে।

হালে বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক এবং বিমানের কলকব্জায় রূপা ব্যবহৃত হচ্ছে।

রূপার প্রথম ব্যবহার প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সম্ভবত মিশরে হয়েছিল। ইজিপ্টের অর্থনীতিবিদ্ মেনে তাঁর অর্থশাস্ত্রে রূপার মূল্যায়ন করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, আড়াই ভাগ রূপার দাম এক ভাগ সোনার সমতুল্য।

মিশরীয়দের কাছ থেকে রোমানরা রূপার ব্যবহার শিখেছিল। প্লিনি তাঁর "Historia Naturalis" গ্রন্থে রূপার আকর থেকে রূপা নিষ্কাশনের আধুনিক ধাতুবিজ্ঞান সম্মত প্রথার কথা লিখেছিলেন।

খুব প্রাচীনকাল থেকে পেরু, মেক্সিকো, বলিভিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশে রূপা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এসব দেশে রূপার বৃহত্তম ভাণ্ডার

সঞ্চিত রয়েছে। এ অঞ্চলের সুবর্ণসমৃদ্ধ মায়াসভ্যতা রূপার শুভ্রতা দিয়েও মণ্ডিত। লোহার বিরলতার দরুন প্রায় সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায় রূপার ব্যাপকতম ব্যবহার হত।

প্রকৃতির বুকে রূপা প্রধানত সীসাযুক্ত খনিজ 'গ্যালেনার' সঙ্গে সহাবস্থান করে থাকে। তা ছাড়া সোনার সঙ্গেও রূপা মেশানো থাকে। সীসা ও সোনা নিষ্কাশনের সঙ্গে রূপাও নিষ্কাশন করা হয়।

পৃথিবীতে মোট যত রূপার উৎপাদন হয়, তার অধিকাংশ আসছে মেক্সিকো থেকে। রূপা উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, পেরু ও বলিভিয়া।

রূপার উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান আপাতত নীচে দিকে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মহীশূরের সোনার খনি থেকে সোনার সঙ্গে রূপা উত্তোলন করা হত। তারপর রাজপুতানার জাওয়ারে দস্তা ও সীসার খনি থেকে সীসাযুক্ত খনিজ রূপা নিষ্কাশনের আয়োজন হয়েছে। ভবিষ্যতে এই খনি থেকে দস্তার ও সীসার সঙ্গে রূপার উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে। তা ছাড়া পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত উচীচ নামে জায়গায় নূতন রূপার খনি পত্তনেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

॥ ৯ ॥

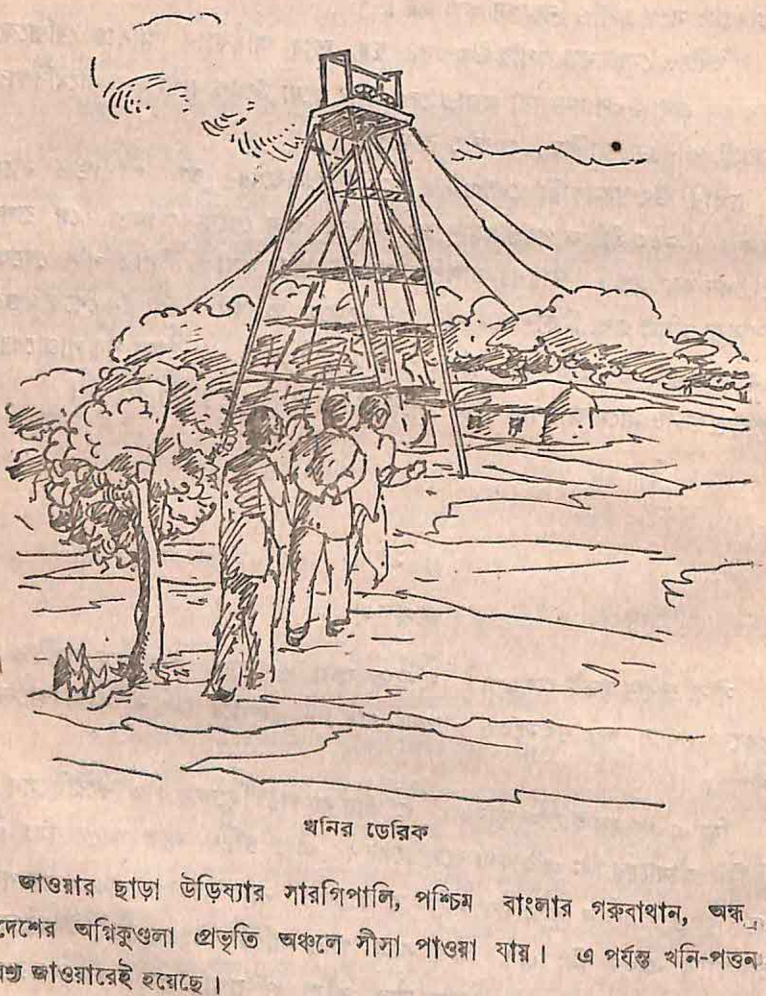
অপরূপা

সীসা রূপার মতই অপরূপা। খনিতে রূপা ও দস্তার সঙ্গে সহ-অবস্থিত। এককে পেলে অন্য দুজনকেও পাওয়া যায়। একবারে নিখুঁত সহঅবস্থানের দৃষ্টান্ত।

মিঃ এ একজন ইংরেজ ভূবিদ। প্র তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনিই আমাদের মিঃ এ'র কথা বলেছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে মিঃ এ এদেশে এসেছিলেন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজে। নানা জায়গায় কাজ করার পর রাজস্থানে এলেন মিঃ এ। প্র'র সঙ্গে তাঁর পরিচয় উদয়পুরে। উদয়পুরের অদূরে জাওয়ারের পাহাড়গুলোতে দস্তা, সীসা ও রূপার সন্ধান করতে করতে প্র'এর সঙ্গে দেখা। প্র-ও সেখানে ভূতাত্ত্বিক সন্ধানে রত ছিলেন।

পরিচয় হওয়া মাত্র প্র'কে সহকারী হিসেবে পেতে চাইলেন মিঃ এ। প্র কোন আপত্তি করেননি।

দুজনে সম্মিলিতভাবে সন্ধান শুরু করেন। দস্তাযুক্ত খনিজ স্ফ্যালেরাইট (Sphalerite) ও সীসাযুক্ত খনিজ গ্যালেনা (Galena) পাহাড়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। গ্যালেনার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে থাকে রূপা।



খনির ডেরিক

জাওয়ার ছাড়া উড়িষ্যার সারগিপালি, পশ্চিম বাংলার গরুবাথান, অন্ধ্র প্রদেশের অগ্নিকুণ্ডলা প্রভৃতি অঞ্চলে সীসা পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত খনি-পত্তন অবশ্য জাওয়ারেই হয়েছে।

সীসাযুক্ত গ্যালেনা গালিয়ে সীসা ও রূপা নিষ্কাশনের আয়োজন হয়েছে

বিহারে ধানবাদের অদূরে। মোচিয়া মংগরার খনি থেকে খনন করা গ্যালেনা সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দস্তাযুক্ত স্ফ্যালেরাইট থেকে দস্তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই এদেশে, কাজেই আকরিক দস্তাকে পরিশোধিত করে জাপানে চালান দেওয়া হয় ধাতু নিষ্কাশনের জন্য।

ভারতে দস্তা ও সীসার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। জাওয়ারের খনি থেকে এই ক্রমশ বেড়ে যাওয়া চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়—কখনো সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না। কাজেই এ দেশের প্রয়োজন মেটাতে বিদেশের দেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়। দস্তা ও সীসায় সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হল অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, মেক্সিকো, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া।

প্রাচীন ভারতে দস্তা ও সীসার খনি ছিল। আজমীরের তারাগড় ও জাওয়ারের পাহাড়গুলিতে প্রাচীন খনির নিদর্শন দেখা যায়। এদের মধ্যে কয়েকটি সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত চালু ছিল। খনির পাশাপাশি ধাতু নিষ্কাশনেরও যে আয়োজন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মিঃ এ তাঁর সহকারী প্র'কে নিয়ে জাওয়ারের প্রাচীন খনির অবশেষগুলির মধ্যে পর্যটন করছিলেন।

ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা পুরনো জাওয়ার গ্রামে এলেন। কাছেই পাহাড়। পাহাড়ে কয়েকটি গুহা আছে। গুহাগুলি নাকি পরিত্যক্ত খনির মুখ।

একটি গুহার কাছে কয়েক পাটি জুতা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি বড় পাথরের আড়ালে জুতোগুলি রাখা আছে।

চামড়ার পিণ্ডে বেঁধানো কয়েকটি লোহার শলাকা মিঃ এ'র নজরে এল। প্র'কে তিনি বললেন, এমন পেরেক আজকাল দেখা যায় না। বোধ হয় শ' খানেক বছর আগেকার তৈরি। জুতোগুলোর বয়সও হয়তো প্রায় একশ' পেরিয়েছে।

প্র—একশ' পেরিয়েছে। তার মানে আপনি বলতে চান—

মিঃ এ—আমি বলতে চাই যে, প্রায় শ' খানেক বছর আগে কয়েকজন এই খনির মধ্যে ঢুকেছিল, কিন্তু তারা ফেরেনি।

প্র—ফেরেনি।

সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে গিয়ে সুড়ঙ্গের অন্ধকারের মধ্যে টর্চের আলো নিক্ষেপ করলেন মিঃ এ। ধারালো আলোর রেখা নেমে গেল নিরেট কালো আঁধারকে ভেদ করে।

সুড়ঙ্গটি খাড়া প্রায় কুড়ি ফুট নীচের দিকে নেমে গেছে। তারপর বেঁকে গিয়ে সোজাসুজি উত্তর দিকে প্রসারিত হয়েছে। প্র'কে মিঃ এ বললেন, মনে হচ্ছে সুড়ঙ্গটিতে ঢোকা যাবে। ভেতরের দিকে ধসে গিয়ে থাকলেও কিছুদূর পর্যন্ত এগোনো যাবে নিশ্চয়ই।

আঁৎকে উঠে প্র বললেন, ঢোকা যাবে মানে! আপনি কী ওখানে ঢোকার কথা ভাবছেন নাকি!

ভুরু কুঁচকে প্র'এর মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ এ বললেন, ভাবছি বই কি। ভেতরে না ঢুকলে ভেতরকার খবর পাওয়া যাবে কী করে। তবে ভয় নেই, তোমাকে ঢুকতে বলব না এখন। প্রথমে শোভারাম ঢুকুক।

বলে তিনি তাঁর আর্দালি শোভারামকে উদ্দেশ করে বললেন, কী শোভারাম, পারবে না ঢুকতে?

'শোভারাম সেলাম করে বললে, আপনি যখন হুকুম করেছেন, নিশ্চয়ই পারব।

প্র—কিন্তু সোজাসুজি ঢুকতে তো ও পারবে না। অনেকখানি নামতে হবে যে।

মিঃ এ—নামতে হবে নিশ্চয়ই। শোভারামের কাঁধের ঝুলিতে এক শ' ফুট লম্বা ম্যানিলা দড়ি আছে। দড়িটা সুড়ঙ্গে নামিয়ে ও নেমে যাক। শোন শোভারাম, নীচে নেমে সুড়ঙ্গটার মধ্যে যতটা পারবে এগিয়ে যাবে। ভাল করে নজর দিয়ে দেখবে সুড়ঙ্গর দেয়ালে এরকম পাথর আছে কিনা। থাকলে স্যাম্পল নেবে।

বলে তিনি শোভারামের হাতে গ্যালেনা ও স্ফ্যালেরাইটের দুটো টুকরো গুঁজে দিলেন।

শোভারাম দড়ি বেয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে গেল—নীচে নেমে সুড়ঙ্গের সরু পথটির ভেতরে ঢুকল হামাগুড়ি দিয়ে। আর তাকে দেখা গেল না।

দড়ি ঝোলানই রইল। শোভারাম ফিরে এসে দড়ি ধরে নাড়া দিলে তাকে উপরে টেনে তুলতে হবে।

মিঃ এ বললেন, আমার স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে ক্যাম্পে একা রয়েছেন—ভাবছি ক্যাম্পে ফিরে যাব। পারবে না তুমি একটু অপেক্ষা করতে শোভারাম ফিরে এলে তাকে টেনে তুলবে। আমার মনে হচ্ছে ও শিগগিরই ফিরে আসবে। বেশি দূর যাবার মত সাহস নিশ্চয়ই ওর হবে না।

প্র – ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করছি।

থ্যাঙ্ক ইউ, বলে চলে গেলেন মিঃ এ।

প্র অপেক্ষা করতে থাকেন। পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গটি যেন আকাশ-মাটি জোড়া আলোর বিস্তারের মধ্যে একটি অন্ধকারের টিপ। কালো বৃত্তের মধ্যে ম্যানিলা দড়ির নিশ্চল রেখাটির দিকে চেয়ে বসে থাকেন প্র।

বেলা গড়িয়ে বিকেল হল। তারপর সন্ধ্যা। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যায়। সুড়ঙ্গটির কালো বৃত্ত বিস্তৃত হতে হতে সমস্ত পাহাড়কে ছেয়ে ফেলে।

কিন্তু ম্যানিলা দড়িতে কোন স্পন্দন জাগে না। শোভারাম ফেরে না। চামড়ার পিণ্ডগুলির দিকে তাকিয়ে প-এর মনে হল যেন একশ' বছর আগেকার সেই দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে।

এই সময়ে হঠাৎ দড়িটা নড়ে উঠল।

উপরে টেনে তুলতেই শোভারাম তারক াধের ঝুলি থেকে বের করল কয়েকটা পাথরের টুকরো। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে তারা উপস্থিত হল মিঃ এ'র ক্যাম্পে।

প্র এগিয়ে গিয়ে মিঃ এ'র হাতে শোভারামের আনা পাথরগুলো তুলে দিলেন।

মিঃ এ বলতে লাগলেন, থিয়েফ্রাস্টাস পারাসেলসাস দস্তাকে মনে করেছিলেন একটা বাজে ধাতু, তাই এর নাম দিয়েছিলেন Zincum বা Zinc কিন্তু তুমি এই পাথরগুলোর দিকে চেয়ে দেখ—এই বলে তিনি শোভারামের আনা পাথরগুলো স্ত্রীর চোখের সামনে তুলে ধরে বললেন, এমন সুন্দর, এমন অপরূপ পাথর তুমি এর আগে আর দেখেছ কি ?......

॥ ১০ ॥

তামা

খ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রায় এক শতাব্দী আগে গ্রীক দার্শনিক লুক্রেশিয়া বিশ্বসৃষ্টির রহস্যকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিশেষ

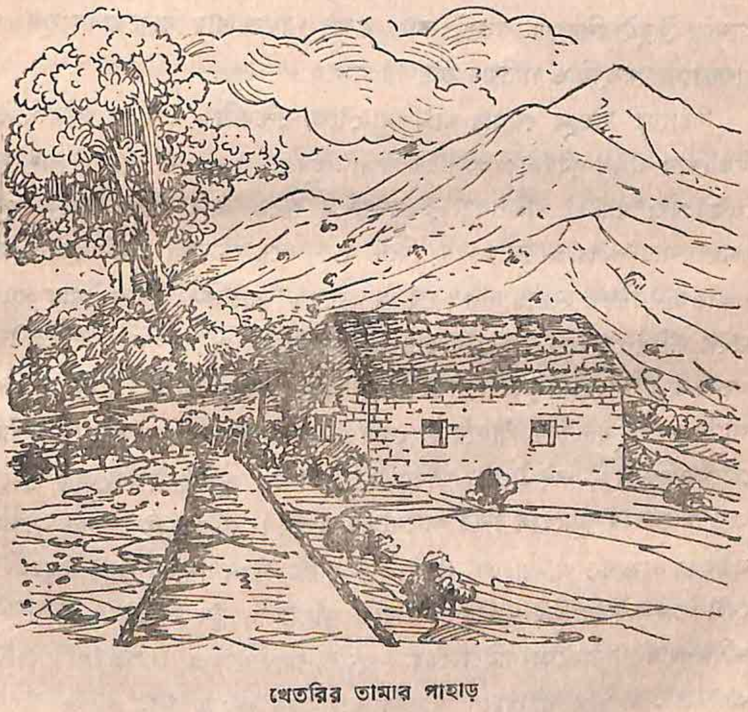
কোনও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্যরকম স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাঁর। সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রগামীদের অন্যতম ছিলেন তিনি। তাঁর সমসাময়িক অজ্ঞানতিমিরান্ধদের মাঝখানে তাঁর একক জ্ঞানবর্তিকা প্রজ্বলন আজ আমাদের চোখে রীতিমত দুঃসাহসিক এবং বিস্ময়কর ঠেকে।

মানব সভ্যতার বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছিলেন লুক্রেশিয়া। ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির যে নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তিনি। নয়া পাথরের যুগের শেষে তামার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সূচনা হল তাম্রযুগের। লোহার আগে মানুষ তামার ব্যবহার করতে শিখল কী করে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লুক্রেশিয়া বলেছেন যে, সভ্যতার সেই প্রথম প্রহরে লোহার তুলনায় তামার প্রাচুর্য ছিল। এই প্রাচুর্যের জন্যই নাকি প্রকৃতির রহস্যাবরণের আড়াল থেকে তামার অস্তিত্ব আদিম মানুষদের গোচরে এসেছে লোহার অনেক আগে।

অথচ আমরা দেখছি যে তামা লোহার তুলনায় অনেক বেশি বিরল শুধু নয়, অনেক বেশি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছে প্রকৃতির বুকে। লোহাযুক্ত খনিজ পদার্থগুলি যেমন আমাদের সহজ আয়ত্তের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে অবস্থান করছে, তামার 'আকর' তেমনি দুর্ভেদ্য রহস্যজালে বন্দী হয়ে আছে মাটি-পাথরের আড়ালে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ-কেওঞ্জরে, বিহারের সিংভূম জেলা এবং মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ ও বস্তার জেলায় বিস্তীর্ণ লোহার পাহাড়গুলিতে বিচরণ ক'রে যে কেউ তার খালি চোখেই লোহার 'আকর' কালো 'হেমাটাইটের' পুঞ্জকে চিনে নেবে। অথচ তামার প্রধান আকর 'চ্যাল্‌কো-পাইরাইটের' সম্ভবপর অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে ভারতবর্ষের ভূ-বিজ্ঞানীরা হিমসিম খাচ্ছেন রাজস্থান, সিকিম এবং সিংভূম অঞ্চলে।

কেবলমাত্র এ দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই লোহার তুলনায় তামা দুর্লভ। এমন কি যে সব দেশ তামার সম্পদে সমৃদ্ধ, সে সব দেশেও লোহার আপেক্ষিক প্রাচুর্য সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূগর্ভে দশ মাইল পর্যন্ত যাবতীয় শিলাপুঞ্জকে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, লোহার গড়পড়তা পরিমাণ যেখানে শতকরা পাঁচ ভাগ, সেখানে তামার পরিমাণ মাত্র শতকরা ০ ০১ – অর্থাৎ খুবই নগণ্য।

লোহার তুলনায় তামার বিরলতা পঁচিশ গুণ হওয়া সত্ত্বেও সভ্যতার সূত্রপাত তামা দিয়ে কী ক'রে হ'ল ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারি নে আমরা। সভ্যতার প্রথম প্রহরে লোহার তুলনায় তামার প্রাচুর্য সম্পর্কে লুক্রেশিয়ার অভিমত যদি মেনে নিতে হয়, তা হলে ধরে নিতে হবে যে, যত তামা এখন পৃথিবীতে আছে, তার পঁচিশ গুণেরও বেশি গত সাত আট হাজার বছরে খনন করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু তা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। কারণ ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার উনবিংশতি শতাব্দীর পূর্বে শুরু হয়নি। তা ছাড়া প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ, লোহার ব্যবহার শেখে। অস্ত্রশস্ত্র, লাঙ্গলের ফলা ইত্যাদি নির্মাণে তামার তুলনায় লোহা যে অনেক বেশি উপযোগী তা জানামাত্র কমে এল ক্রমশ তামার ব্যবহার।



খেতরির তামার পাহাড়

কাজেই সভ্যতার উষালগ্নে তামার যে প্রাচুর্য লুক্রেশিয়া কল্পনা করেছেন, তা কল্পনা বলেই মনে হয়। অতএব প্রশ্ন থেকেই যায় লোহার আগে তামার ব্যবহার করতে মানুষ শিখল কী করে।

যেখানে যেখানে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হয়েছিল, অর্থাৎ এ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীন—সে সব দেশে তামার প্রাচুর্য নেই বলেই আমরা জানি। পৃথিবীর অধিকাংশ তামা যে দেশগুলিতে সঞ্চিত রয়েছে, অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকার চিলি, রাশিয়া ও আফ্রিকার রোডেশিয়া—তাম্রযুগে এ সব অঞ্চলে সভ্যতার নিদর্শন বৈজ্ঞানিকভাবে সন্ধান সাপেক্ষ। মেক্সিকো ও পেরুতে বিকশিত প্রাচীন মায়া-সভ্যতার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং চিলির তামার সম্পদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে তামা সুলভ না হলেও তামার ব্যবহারে বৈজ্ঞানিক দক্ষতার চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাই আমরা প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে। ছ' সাত হাজার বছর আগেকার খনিবিশারদ এবং ধাতুবিদদের কাছ থেকে যে আমাদের অনেক কিছুই শিখবার আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিহারের সিংভূম এবং রাজস্থানের খেত্‌রি ও দারিবার তাম্রখনি অঞ্চলে।

বিহারের সিংভূম জেলায় ঘাটশিলা থেকে পশ্চিমদিকে তাকালে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রসারিত নীলাভ ধূসর রঙের বনে ছাওয়া পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায়। ঘাটশিলার উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় নব্বই মাইল দূরে সরাইকেলার অন্তর্গত দুয়ারপরম থেকে শুরু করে সুসমঞ্জস একটি রেখার মত পাহাড়গুলি বিস্তৃত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে। ঘাটশিলা থেকে প্রায় বারো মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে বহেরাগোড়ায় এই পাহাড়ের শ্রেণীর অবসান। শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি পাহাড়—টুকরো টুকরো, বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাদের মধ্যে যে ঐক্য আছে, তা শুধু মানচিত্রে আঁকাবাঁকা রেখাগুলির বিন্যাসে নয়, পর্যটকদের শাদা চোখেও পড়বে। এই ঐক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা কোটি কোটি বছর আগেকার ভূসংস্থান নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু ভূবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জটিলতা এড়িয়েও আমরা এই ঐক্যের মূলসূত্রটি চিনে নিতে পারি সহজেই। সেটা হচ্ছে এই যে, এই পাহাড়গুলির মধ্যে আগাগোড়া টুকরো টুকরো তামাবাহী খনিজপদার্থ 'চ্যালকো-পাইরাইটের' সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করছে 'কায়ানাইট্' নামে আর একটি খনিজ-পদার্থ। খুব উচ্চ তাপ সহনশীল চুল্লী নির্মাণের জন্য এই খনিজপদার্থটির প্রয়োজন হয়।

নীলাভ রঙের 'কায়ানাইটের' অস্তিত্ব প্রকাশ্য হলেও তামার কোনও প্রত্যক্ষ

চিহ্ন এই পাহাড়গুলির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুদূর অতীতে যে এখানে তামার খনি ছিল, স্থানীয় কিংবদন্তীর মধ্যে তার ক্ষীণ স্মৃতি অস্পষ্টভাবে ধরা পড়লেও স্থানীয় লোকেরা সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও অবহিত ছিল না। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন জে সি হটন সরাইকেলায় নারায়ণপুরের কাছাকাছি 'তামা ডুঙ্গরি' পাহাড়টির নাম থেকে সেখানে তামার অস্তিত্ব অনুমান করেন এবং ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেন সেখানে। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ফলে রাজদা থেকে বাদিয়া পর্যন্ত তামার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল এবং ১৯১৪ সাল থেকে ঘাটশিলার উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় দশ মাইল দূরে, রাখা মাইনসে 'কেপ কপার কর্পোরেশন' কর্তৃক তামার খনির সূত্রপাত হ'ল। ১৯২১ সালে এই খনি বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯২৪ সাল থেকে ঘাটশিলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোসাবনিতে 'ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের' পরিচালনায় তামার 'আকরের' খননের কাজ শুরু হ'ল।

তামা খুঁজতে খুঁজতে ভূতাত্ত্বিকেরা এই অঞ্চলে কয়েকটি প্রাচীন তামার খনির সন্ধান পেয়েছেন। রাখা মাইনস্ রেল-ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের গায়ে বহু পুরানো একটি খনির প্রবেশমুখ রয়েছে। এই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে একটি অতি আশ্চর্য খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই খনির মধ্যে প্রাচীন খনিবিজ্ঞানীদের নৈপুণ্যের এমন সব নিদর্শন রয়েছে যা দেখে আধুনিক খনিবিজ্ঞানীরাও চমৎকৃত হন। এমন নিখুঁত খনন নাকি আধুনিকতম যান্ত্রিক পদ্ধতিতেও সম্ভব নয়। খনির সুড়ঙ্গপথগুলোকে অটুট রাখবার জন্য স্তম্ভগুলো ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রাখা হয়নি। বিশিষ্ট অষ্ট্রেলিয়ান ভূতাত্ত্বিক ডক্টর ডানের মনে হয়েছে যেন দাঁত খুঁটবার খড়কে দিয়ে খনন করা হয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর পাহাড় এবং রাজদা ও বাদিয়ার মধ্যবর্তী অন্যান্য পাহাড়র নীচে আকর থেকে ধাতব তামা নিষ্কাশনের নিদর্শন দেখা যায়। তামার আকর থেকে তামা বের করে নেওয়ার পর গলিত তামার ওপর খুব শক্ত কাল রঙের এক রকমের হাল্কাগোছের পদার্থ ভাসতে থাকে, ইংরেজীতে তাকে বলে স্ল্যাগ। সিদ্ধেশ্বর ও আর সব পাহাড়ের নীচে স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে এই সব স্ল্যাগ্। স্ল্যাগ্গুলি থেকে নমুনা নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আধুনিক

স্ল্যাগের সঙ্গে এর বিশেষ তফাৎ নেই। অর্থাৎ পদ্ধতি যেমনই হোক, তামার আকর থেকে অধিকাংশ তামা নিষ্কাশন করে ফেলার কৌশল প্রাচীন ধাতুবিদ্‌রা জানতেন। ধাতু গালাই করার 'টাল্‌ক্' পাথরের তৈরি কিছু পাত্রও পাওয়া গেছে জায়গায় জায়গায়।

সিংভূমের এই প্রাচীন তামার খনিগুলো কবেকার তার সুস্পষ্ট হদিস মেলে না। তবে এই খনিগুলোর আদি ইতিহাস যে তাম্রযুগের প্রথম সূচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তা অনুমান করা যেতে পারে। খনি থেকে খনন করা তামার আকর চ্যাল্‌কো পাইরাইটগুলোকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করার জন্য যে সব পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হ'ত, তাদের কিছু নিদর্শন সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছে। এগুলো নয়া পাথরের যুগের স্মারক, কাজেই তাম্রযুগের সূচনাকেও চিহ্নিত করছে।

স্থানীয় 'কোল' ও 'ভূমিজদের' মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তীতে কথিত হয়েছে যে নাগবংশীয় রাজারা এই তামার খনির অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। অনুমান করা যেতে পারে যে, এই রাজাদের নির্দেশেই এইসব খনির কাজ চলত। রাখা মাইন্‌স রেল ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে একটি পাহাড়ে ল্যাটেরাইট্ পাথর দিয়ে গড়া প্রাচীন দুর্গের দেয়ালের সামান্য কিছু অবশেষ পাওয়া গেছে। দেখলেই বোঝা যায় যে খুব সুরক্ষিত দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। দুর্গে ঢোকার জন্য পাহাড়ের তিন দিক থেকে তিনটি গোপন সুড়ঙ্গপথ এখনো রয়েছে। সম্ভবতঃ খনি থেকে নিষ্কাশন করে আনা তামাগুলোকে এই দুর্গেই সংরক্ষিত করা হ'ত।

তামা-অঞ্চলের অদূরেই সুবর্ণরেখা নদী। এই নদীর ধারে পিপলি নামে একটি গ্রাম আছে। প্রাচীনকালে এই গ্রামে যে একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই বন্দর থেকে নৌকা বোঝাই করে তামা চালান দেওয়া হ'ত তাম্রলিপ্তের দিকে—সেখান থেকে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের বাইরেও রপ্তানি করা হ'ত।

জলপথ ছাড়া স্থলপথেও এই বাণিজ্য চলত। ঘাটশিলা থেকে তমলুক পর্যন্ত প্রাচীন একটি সড়কের কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে এই পথ দিয়ে অশোকের আমলে চীনদেশের ধাতুবিদ্ ও খনিবিদ্‌রা এসেছেন এই তামার খনির অঞ্চলে। রাখা মাইন্‌সের কাছাকাছি একটি গুহায় একটি মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে, যাতে চৈনিক লক্ষণের প্রাধান্য আছে।

চীন বা যে কোনও দেশের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হোক না কেন, এদেশে আর্যদের আসার অনেক আগে অনার্যরা খনি ও ধাতুবিজ্ঞানে যে তৎপরতা দেখিয়েছিলেন পাথরের তৈরি হাতে-চালানো যন্ত্রপাতিমাত্র সম্বল করে, তাতে আধুনিক যন্ত্রচালিত খনির পরিকল্পনাকারীরাও বিস্ময়ে বিমূঢ় না হয়ে পারেন না। সিংভূমের গভীর অরণ্যে ভূগর্ভে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এক বিচিত্র সভ্যতা, যা এই অরণ্যের মতোই রহস্যময়। সভ্যতার বিবর্তনের যে ক্রমকে আমরা মেনে নিই, প্রাচীন খনিবিজ্ঞানের উৎকর্ষের চিহ্নগুলি সেই ক্রমকে ডিঙ্গিয়ে চলে এসেছে বর্তমান যুগের কিনারায়।

কবে পর্যন্ত সিংভূমের তামা অঞ্চলে প্রাচীন খনিগুলি সক্রিয় ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় নি। সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের কাছাকাছি কুষাণ আমলের কিছু তামার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। খ্রীষ্টের জন্মের অব্যবহতি পরেও যে খনিগুলো চালু ছিল তার প্রমাণ এই মুদ্রাগুলি। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত খনিগুলোতে কাজ চলত। তারপর বন্ধ হয়ে গেল।

কেন বন্ধ হল তার কারণ খুব স্পষ্ট নয়। কেউ কেউ বলেন যে, অশান্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরামহীন সংঘর্ষ ও সংগ্রাম পূর্ব ভারতের তামার খনির ইতিহাসের ওপর যবনিকাপাত করেছিল। খনি-গুলোর সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগেরও অবসান হল যেন। সে যুগ আলোর যুগ, বিকাশের যুগ। তারপর এল আঁধারে ঘেরা যুগ—আচ্ছন্ন করল স্থানীয় লোকেদের। তারা ভুলেই গেল যে একদা এখানে তামার খনি ছিল।

মোসাবনী, বাদিয়া, সুরদা, পাথরঘোড়া, রোয়াম-সিদ্ধেশ্বর, তামা পাহাড়, রামচন্দ্র পাহাড়, নানডুব, বয়ানবিল, তুরামডি প্রভৃতি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে সিংভূমের এই তাম্রক্ষেত্র। তার দৈর্ঘ্য ২০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি—পূবে ময়ূরভঞ্জ জেলা থেকে পশ্চিমে মনোহরপুর পর্যন্ত তার প্রসার। এই সুদূর-প্রসারী তাম্রক্ষেত্রে তামার ভাণ্ডারের সীমা-পরিসীমা নেই—এ পর্যন্ত পাঁচটি খনি গ'ড়ে উঠেছে এখানে এবং আরও খনি পত্তনের আয়োজন চলছে।

সিংভূমের তাম্রক্ষেত্রের পরই নাম করতে হয় রাজস্থানের ক্ষেত্রীর প্রায় একশো কিলোমিটার লম্বা তাম্রক্ষেত্রের। প্রাচীন খননের চিহ্ন অনুসরণ ক'রে

এখানে বিপুল তাম্রভাণ্ডারের সন্ধান মিলেছে এবং খনি গ'ড়ে তোলা হয়েছে। খননযোগ্য তামার ভাণ্ডার এদেশের আরও নানা জায়গায় আছে—যেমন, মধ্যপ্রদেশের মালাঞ্জখণ্ড, কর্ণাটকের চিতলদুর্গ, অন্ধ্র প্রদেশে অগ্নিগুনডলা ও ময়লারাম, রাজস্থানের দারিবা, প্রতাপগড়, গনধোয়া, বিহারে হাজারিবাগ জেলার বারগানডা, পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া জেলার তামাখুন প্রভৃতি। প্রাচীন খনির চিহ্ন এ সব অঞ্চলেও আছে। এই সব প্রাগৈতিহাসিক খনি পরীক্ষা ক'রে প্রাচীন খনিবিদ্দের তৎপরতা এবং তামায় প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধিকে সনাক্ত করা যায়।

এই লোপ পাওয়া সমৃদ্ধিকে কী পুনরুদ্ধার করা যায় না ?

এ নিয়ে ভাবছেন ভূবিজ্ঞানী এবং খনিবিজ্ঞানীরা।

॥ ১১ ॥

ভারতসভ্যতায় লৌহস্বাক্ষর

মানুষ তামাকে প্রথম চিনলেও মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে লোহা ও ইস্পাত। সভ্যতার বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে লোহার স্বাক্ষর। লোহা যতদিন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি, জীবজগতে মানুষের শক্তি ও প্রাধান্য তেমন প্রকট হয়ে ওঠে নি।

লোহার আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের ক্রমবিকাশের বিচিত্র সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করেছে—প্রেরণা পেয়েছে নিজের জীবসীমা অতিক্রম করে যাওয়ার। লোহার মধ্যে নিজের শক্তির সীমাহীনতাকে আবিষ্কার করেছে সে।

লোহা মানুষকে সচল করে দিয়েছে বর্তমান অগ্রগতির পথে।

লোহা দিয়ে লাঙলের ফলা নির্মিত হয়ে কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে বিপ্লব সঞ্চারিত করল। লোহার লাঙল ব্যবহারের আগে যে মাটি সামান্য দিত, লোহা দিয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে তার দান অসামান্য হয়ে উঠল। লোহার ছোঁয়ায় প্রকৃতির দেবার কুণ্ঠা ঘুচল। মাটির ভেতরকার সরসতাকে সংহত করে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষামত ফসল ফলাল। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অনাসৃষ্টি সৃষ্টি করলেও মাটির কাছে মানুষের দাবি আর কখনো নিষ্ফল হল না।

কৃষিকর্মের মধ্যে বেগের আবেগ এনে দিয়ে লোহা মানুষের চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করেছে শিল্পক্ষেত্রে উত্তরণের। লোহা দিয়ে যন্ত্র তৈরি করে মানুষ স্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়েছে। লোহার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে শিল্প-মনস্কতার উন্মেষ হল। যান্ত্রিকতায় সম্পূর্ণ দীক্ষা পেতে অবশ্য তার বহু শতাব্দী লেগেছে—অনেক সময় লেগেছে লোহার জড়তাকে সচল করে যন্ত্রযুগের উদ্বোধন করতে।

মানুষের সভ্যতার বিকাশের ক্রমগুলিকে পাথর, তামা ও লোহা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তামা আবিষ্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত মানুষ ধাতু-সচেতন হয় নি। পাথর দিয়ে তৈরি করেছে সে তার প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। তামার ব্যবহার জ্ঞাত হবার পর থেকে অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র, লাঙলের ফলা ইত্যাদি তামা দিয়ে তৈরি করা হতে থাকে। তামার পর অনতিবিলম্বেই লোহা আবিষ্কৃত হল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রায় সাত আট হাজার বছর আগে তামার আগেই লোহার আবিষ্কার হয়। তাঁরা বলেন যে, মানব সভ্যতায় প্রস্তরযুগের পরই এসেছে লৌহযুগ। পাথর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে করতে লোহাযুক্ত পাথরকে চিনেছে তারা। আগুন দিয়ে গলিয়ে এই পাথর থেকে লোহা নিষ্কাশনের কৌশল শিখেছে তারা ক্রমশ। এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে অবশ্য আরও অনুসন্ধান ও সমীক্ষার প্রয়োজন। তবে এটা ঠিক যে, লোহার আবিষ্কার তামার আগে বা পরে যখনি হোক না কেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রাধান্য স্বীকৃতি পেতে বিলম্ব হয় নি। ধাতুদের মধ্যে লোহাই একমাত্র ধাতু যা দাবী করতে পারে, এলাম ও জয় করলাম।

আবিষ্কারের মুহূর্ত থেকেই লোহার জয়যাত্রা শুরু হয়েছে কোনও বাধা বা সীমা না মেনে। যে কোনও দেশ বা জাতির বনিয়াদ রচিত হয়েছে লোহা দিয়ে। যে যত দক্ষভাবে লোহা বা ইস্পাতকে ব্যবহার করতে পেরেছে, সে তত সমৃদ্ধি ও শক্তির অধিকারী হয়েছে। য়ুরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপানের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে লোহা। ইংরেজদের বিশ্বময় রাজত্ব বিস্তারের ইতিহাস লোহা ও ইস্পাত থেকে শক্তি আহরণের ইতিহাস।

যে কোনও দেশের শিল্পায়নের পরিকল্পনার প্রথম ধাপেই থাকে লোহার উৎপাদন বাড়াবার তাগিদ। লোহাযুক্ত খনিজ পদার্থ বা আকরের অভাব ঘটলে বিদেশ থেকে তার আমদানীর প্রয়োজন হয়। জাপানে প্রয়োজনের অনুপাতে

লোহার আকরের একান্ত অভাব। কাজেই লোহার আকরে সমৃদ্ধ দেশগুলি থেকে ব্যাপকভাবে আমদানীর আয়োজন করা হয়েছে সেখানে।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আমাদের দেশ লোহা ও ইস্পাতে সমৃদ্ধ। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনেকেরই ধারণা যে, লৌহযুগের সূচনা ভারতেই হয়েছিল। এখান থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে লোহা ও ইস্পাতের নিয়মিত রপ্তানি হত।

বৈদিক আমলেরও বহু পূর্বে লোহাযুক্ত আকরকে অঙ্গার দিয়ে গলিয়ে লোহা নিষ্কাশনের কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন ভারতীয় ধাতুবিদ্‌রা। ঋগ্বেদ যখন লেখা হল, তখন ভারতীয়রা লোহাকে পরিশোধিত ও অঙ্গারকযুক্ত করে ইস্পাত নির্মাণেও সমর্থ হয়েছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে লোহার মত ইস্পাতের আবিষ্কারও এদেশেই হয়েছে।

ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, লোহাযুক্ত খনিজের পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ভাণ্ডার ভারতে রয়েছে। বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের বাইলাদিলা, রাওঘাট ও দাল্লি-রাজহারা, মহীশূরের বাবাবুদন, হোসপেট ও বেলারি, পশ্চিমঘাট, মাদ্রাজের সালেম, হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে লোহাযুক্ত খনিজ "হেমাটাইটের" বিস্তীর্ণ সঞ্চয় আছে। অন্যান্য খনিজের মত প্রচ্ছন্নভাবে নয়, প্রকাণ্ড পাহাড়ের আকারে এর অবস্থান। নিরেট লোহার আকরের এমন পাহাড় প্রমাণ সঞ্চয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

ভারতীয় লোহার আকরে গড়পরতা শতকরা ষাট ভাগের বেশি লোহা আছে। এমন বিশুদ্ধ লোহাযুক্ত খনিজ এদেশ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। ভূবিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত যা হিসাব-নিকাশ করেছেন, তাতে জানা যায় যে, একুশ শ' কোটি টনেরও বেশি বিশুদ্ধ লোহার আকর সঞ্চিত আছে এদেশে—পৃথিবীর মোট সঞ্চয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। আরও গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে এই অঙ্কটা অনেক বেড়ে যাবে সন্দেহ নেই। তাছাড়া আছে কোয়ার্টজাইটযুক্ত অবিশুদ্ধ লোহার আকর যা পরিমাণেরও অতীত।

আমাদের এত লোহা—কিন্তু সেই লোহার কতটুকু আমরা পেরেছি ব্যবহার করতে! লোহা ও ইস্পাতের কঠিন ভিত্তিতে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে পাকা করে গাঁথবার প্রাথমিক আয়োজন এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। বিদেশীদের সাহায্যে কয়েকটি লোহা ও ইস্পাত নির্মাণের কারখানা তৈরি করে

আমরা দেশের শিল্পায়নের গোড়াপত্তন করেছি মাত্র। ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ইস্পাত উৎপাদন করতে এখনো দেরি আছে। আরও বিলম্ব আছে দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের ইস্পাত উৎপাদনে, যার ফলে দেশের বর্তমান সঙ্কটলগ্নে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করতে হচ্ছে।

প্রকৃতির বদান্যতায় আমরা যত লোহা পেয়েছি তাকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারলে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পসমৃদ্ধির অধিকারী হ'তে পারতাম আমরা। কিন্তু আমরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে পুরোপুরি চিনতে পারিনি। আমাদের লৌহসম্পদ আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসেনি এখনো।

অথচ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেছেন যে, প্রায় সাত আট হাজার বছর আগে এদেশেই লোহার আবিষ্কার হয়েছিল এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোহা ও ইস্পাতের প্রয়োজন এদেশ থেকেই মিটেছে হাজার হাজার বছর ধরে।

হিন্দুরা ইতিহাস লিখতেন না। আত্মবিস্মৃতি আমাদের মজ্জাগত। কাজেই আমাদের কীর্তিকলাপের নজির খুঁজতে হয় অন্যান্য দেশের ইতিবৃত্তের মধ্যে। মিশরীয়রা খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই তিন হজার বছর আগে অতিকায় পিরামিড নির্মাণে জন্য যে লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিলেন, তা যে ভারত থেকেই আমদানি করা হয়েছিল তার প্রমাণ মিশরের ইতিহাস থেকে আহরণ করতে হচ্ছে। প্রাচীন ইজিপ্ট ভারত থেকে লোহা ও ইস্পাতের আমদানি করা ছাড়া সে দেশের ইস্পাতশিল্পের প্রবর্তনের জন্য ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়েছিল। প্রায় আঠারশ' খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়রা যে ভারতের ধাতু-বিজ্ঞানীদের কাছে লোহা নিষ্কাশন করতে শিখেছিল, তারও নির্দেশ মিলছে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস থেকে।

ভারতের সর্বত্রই যে লোহার উৎপাদন করা হ'ত তার নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিকদের কাছে ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও মাদ্রাজে লোহা নিষ্কাশনের চুলীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। অন্ধ্র প্রদেশের গোদাবরীর তীরে 'কোনাসমুদ্রমে' অতি প্রাচীন ইস্পাত নির্মাণের নিদর্শন রয়েছে। স্থানীয় ভাষায় এখানকার ইস্পাতকে বলা হয় 'উৎজ্'। এই নামেই কোনাসমুদ্রমের ইস্পাত মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপে রপ্তানি করা হ'ত। কোনাসমুদ্রমের নিকটবর্তী 'নির্মল' নামে জায়গাটিতেও

ইস্পাতের উৎপাদন হ'ত। মধ্যপ্রাচ্যে এই ইস্পাত 'নির্মল ইস্পাত' নামে পরিচিত ছিল। দামাস্কাসে এই ইস্পাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি ক'রে ইয়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হ'ত। ভারতীয় ইস্পাত দিয়ে তৈরি দামাস্কাসের তলোয়ারের বিশেষ চাহিদা ছিল ইয়োরোপের সর্বত্র। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের ইস্পাত দিয়ে রকমারি অলঙ্কারও প্রস্তুত করা হত। সোনার অলঙ্কারের মতই ছিল তাদের সমাদর।

লোহা ও ইস্পাতের সমৃদ্ধির দরুন ভারতবর্ষ মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপের চোখে পেয়েছিল বিশিষ্ট মর্যাদা। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এদেশের লোহা ও ইস্পাত। আলেকজাণ্ডারের কাছে পুরুর পরাভবের পর পুরু তাঁকে ত্রিশ পাউণ্ড ইস্পাত উপহার দিয়েছিলেন। আজকের দিনে এই উপহার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। কিন্তু বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারের কাছে এই উপহার ছিল অমূল্য। এর থেকে বোঝা যায় আলেকজাণ্ডারের আমলে পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলিতে লোহা বা ইস্পাত কতখানি দুর্লভ ছিল।

ভারতে উৎপন্ন লোহা ও ইস্পাতের সম্ভবতঃ অধিকাংশ মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপে রপ্তানি করা হ'ত। ভারতে লোহা ও ইস্পাত মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপের দেশগুলিকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। কিন্তু খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনে সমর্থ হয়েও লোহা ও ইস্পাতেয় অন্তর্নিহিত অন্তহীন সম্ভাবনা ভারতীয়দের কাছে সুস্পষ্ট হয়নি। লোহা ও ইস্পাতকে দেশের শক্তি-বৃদ্ধির কাজে তাঁরা লাগাতে পারেননি, যদিও লোহা দিয়ে স্মারক স্তম্ভ রচনায় তাঁরা পটু ছিলেন।

এই সব লৌহস্তম্ভের যে সব নিদর্শন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিল্লীর কুতব মিনারের বাগানে সংরক্ষিত স্তম্ভটি। অদাগী লোহা দিয়ে স্তম্ভটি তৈরি হয়েছিল তৃতীয় বা চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে। স্তম্ভটি তৈরি করার পর প্রায় ষোল শ বছর কেটে গেছে—কিন্তু এখনো তাতে মরচের সামান্য দাগও পড়েনি। ইস্পাতকে রাসায়নিক অবক্ষয় নিরোধক করে তুলে তা থেকে কালজয়ী বিজয়স্তম্ভ রচনার প্রয়াসে মধ্যে আছে ধাতু-বিজ্ঞানের কুশলতার চরম পরিচয়। কিন্তু এই দক্ষতাকে দেশের শক্তি বাড়াবার জন্য যথোপযুক্ত প্রয়োগ করা হয়নি কখনো।

পাঠান ও মোগলরা ভারত থেকে রপ্তানি ইস্পাত ও লোহা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে সেই সব অস্ত্রের বলে ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন। আমাদের লোহা ও ইস্পাত আমাদের কাছে ফিরে এসেছিল আক্রমণকারীর আঘাতের মধ্য দিয়ে।

তারপর এলেন ইংরেজরা। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে উনবিংশতি শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ভারত থেকে লোহা ও ইস্পাত রপ্তানি করা হ'ত। বিশেষ ক'রে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ইস্পাতের বিশেষ সমাদর ছিল। উনবিংশতি শতাব্দীর মাঝামাঝি সেখানে 'ব্রিটানিয়া' ব্রিজ তৈরি করা হ'ল ভারতীয় ইস্পাত দিয়েই। ইংরেজদের ভারত আক্রমণে ভারতীয় ইস্পাত ও লোহা থেকে প্রস্তুত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হ'য়েছিল ব'লে অনুমান করা চলে। পাঠান-মোগলদের মত ইংরেজরাও আমাদের শক্তির দৈন্যকে প্রকট ক'রে তুললেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে,

'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন,
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন,
ওগো তায় জাগাইনু রে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে, যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘদিনের মৌন তাহার আজ ভাঙাইনু রে।
অচল ছিল, সচল হ'য়ে ছুটেছে ওই জগৎ জয়ে—
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে ॥'

লোহার কঠিন ঘুম আমরা ভাঙিয়েছিলাম সভ্যতার উষালগ্নে। লক্ষ যুগের অন্ধকার থেকে তাকে আমরা সবার আগে উদ্ধার করেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের হাতের তলে এখনো পারিনি তাকে পোষ মানাতে।

প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে ইস্পাত নির্মাণের পালা শেষ হ'য়েছে উনবিংশতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ইংরেজদের আনুকূল্যে বিগত শতাব্দীর শেষদিকে আধুনিক লোহা ও ইস্পাত শিল্পের ক্ষীণ সূচনা হ'ল। কুলটি, বার্নপুর, টাটানগর এবং মহীশূরের ভদ্রাবতীতে লোহা ও ইস্পাত শিল্প প্রবর্তিত হয়েছিল ইংরেজদের আমলে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দুর্গাপুর, রাউরকেলা, বোকারো এবং ভিলাইতে লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনের আয়োজনের মধ্যে দেশের শিল্পের বনিয়াদকে পাকা

ক'রে তোলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে খানিকটা। কিন্তু যে বিপুল লৌহসম্পদ এখনো পাথরের স্তূপে 'লক্ষ যুগের অন্ধকারে' প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, তাকে পুরোপুরি জাগাবার আয়োজন এখনো হয়নি। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে গহন বনের নিভৃতে যে লোহার আকর অচল হয়ে আছে, তাকে সচল ক'রে তুলে 'জগৎ জয়' করা এখনও কল্পনামাত্র। কিন্তু এই কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হ'তে হবে।

॥ ১২ ॥

ইস্পাততর

লোহাকে অঙ্গারক (carbon)-যুক্ত করে ইস্পাত নির্মাণ করার পর "ইস্পাততর ইস্পাতের" চাহিদা অনুভব করেছে মানুষ। প্রথম যখন ইস্পাতের আবিষ্কার হয়, তখন বিশেষ প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তার ব্যবহার। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমশ এই প্রয়োজনের সীমাবদ্ধতা ঘুচেছে, মানুষের দাবী সাধারণ ইস্পাতের দেবার ক্ষমতাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। সভ্যতার আদি ও মধ্যপর্বে হাতে চালানো হাতিয়ারের জন্য সাধারণ ইস্পাতই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু যন্ত্র আবিষ্কারের পর এই ইস্পাতের শক্তির সীমাবদ্ধতাকে চেনা গেল। তখন প্রয়োজন ও আয়োজন হল ইস্পাতকে তার বিশেষ দ্রব্যগুণ পেরিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

জড় বস্তুকে পরিমিত করে রাখে তার বস্তুসীমা। কিন্তু দ্রব্যগুণকে প্রসার করা চলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়।

জেমস ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করার পর শুরু হল পৃথিবীতে যন্ত্রের আধিপত্য। বাষ্পের অন্তর্নিহিত শক্তি জেমস ওয়াটকে বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কারের প্রেরণা দিলেও এই আবিষ্কারকে বাস্তব রূপ দিতে অপরিহার্য ছিল ইস্পাতের আধারের। শক্তির প্রয়োগের জন্য চাই উপযুক্ত অবলম্বন। নিরালম্ব শক্তির মধ্যে শক্তির প্রকাশ নেই। বাষ্প থেকে উদ্ভূত শক্তি শুধু নয়, খনিজ তেল, বিদ্যুত, জল বা পরমাণু, যে কোনও উৎস থেকে আহরণ করা শক্তিকে মুক্তি দিতে চাই বিশেষ আধারের মধ্যে তাকে সংহত করার ব্যবস্থা। এই আধার হল ইঞ্জিন

যায় মধ্য দিয়ে শক্তি মুক্তিকে দিতে হবে, তাকে উপযুক্ত পরিমাণে শক্তিশালী না করে উপায় নেই। ইস্পাতই একমাত্র ধাতু যা সব রকম শক্তিকেই ধারণ করতে পারে।

যন্ত্রের ব্যবহার যখন শুরু হল, সাধারণ ইস্পাত দিয়ে যে কোনও যন্ত্রের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করতে কোনও অসুবিধে হত না। তখন যন্ত্র ছিল না তেমন গতিশীল। সাধারণ ইস্পাতই পারত সেই পরিমিত গতি সঞ্চার ও ধারণ করতে। তারপর ক্রমশ যন্ত্রের কাছ থেকে মানুষের প্রত্যাশা বাড়ল। যন্ত্রের মধ্যে অপরিমিত বেগের আবেগ এনে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন বিজ্ঞানীরা। ফলে বাড়াতে হল যন্ত্রের উৎকর্ষ।

মানুষের অন্তহীন চাহিদা মেটাতে যন্ত্রের রূপ বদলায়। যন্ত্র উপনীত হয় যন্ত্রান্তরে। তার মৌল প্রকৃতির সঙ্গে আঙ্গিকেরও পরিবর্তন করতে হয়।

যে কোনও যন্ত্রের মূল উপকরণ হল ইস্পাত। যন্ত্রের উৎকর্ষ যত বাড়ে ইস্পাতের মৌল প্রকৃতির উন্নয়নের চাহিদা তত আসে। প্রয়োজন হয় সাধারণ ইস্পাতের চেয়েও শক্তিশালী ইস্পাতের। ধাতু বিজ্ঞানীরা ইস্পাতের সঙ্গে অন্য ধাতু মিশিয়ে ইস্পাতের শক্তি বৃদ্ধির আয়োজন করলেন।

ইস্পাতকে সাধারণ ইস্পাতের চেয়ে কঠিন ও শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করে ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, টাঙস্টেন, ভ্যানেডিয়াম প্রভৃতি ধাতু। আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজনে ইস্পাতকে এই সব ধাতুর যে কোন একটির সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে হয়।

ম্যাঙ্গানিজ দিয়ে বিশেষ ইস্পাতই শুধু তৈরি হয় না, সাধারণ ইস্পাত উৎপাদনেও ম্যাঙ্গানিজ অপরিহার্য।

ম্যাঙ্গানিজের খনিজ থেকে প্রস্তুত করা হয় লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও অঙ্গারকের সমাহার একটি যৌগিক পদার্থ, যার নাম "ফেরো ম্যাঙ্গানিজ"। ম্যাঙ্গানিজের ভাগ কম হলে তাকে বলে "স্পিয়েগেলাইসেন"। ইস্পাত উৎপাদনের সময় গলানো লোহাতে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ বা স্পিয়েগেলাইসেন মেশানো হয়। ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ বা স্পিয়েগেলাইসেন লোহাতে প্রয়োজন মত অঙ্গারক যোগ করে এবং লোহাকে পরিশোধিত করে। ইস্পাতকে লোহা ও ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ বা স্পিয়েগেলাইসেনের যোগফল বলা চলে।

আবার সাধারণ ইস্পাতে ম্যাঙ্গানিজ ধাতু যুক্ত করে বিশেষ ধরনের ইস্পাত

তৈরি করা হয়। শতকরা সাত থেকে ত্রিশ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ মেশালে ইস্পাতের শক্তি অসাধারণ রকম বাড়ে। বড় আকারের দ্রুত গতিযুক্ত মেশিনে এই ইস্পাত ব্যবহার করা চলে। তা ছাড়া ম্যাঙ্গানিজযুক্ত ইস্পাতে চৌম্বক শক্তির কোন প্রতিক্রিয়া হয় না বলে ইস্পাত দিয়ে রেলপথ তৈরি করতে খুবই সুবিধা হয়।

ম্যাঙ্গানিজ মূলত ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া তাকে রসায়ন শিল্প ও কাচ রাঙাবার কাজেও লাগানো হয়।

ম্যাঙ্গানিজ-যুক্ত খনিজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "পাইরোলিউসাইট", "সাইলোমিলেন" ও "ব্রনাইট"। এই সব খনিজের বিপুল সঞ্চয় রয়েছে ভারতবর্ষে —বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, অন্ধ্র ও রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে। এখন পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া যায়, তাতে মোট প্রায় দশ কোটি টন ম্যাঙ্গানিজের আকর এ দেশে সঞ্চিত আছে। ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করে ভবিষ্যতে হয়তো নূতনতর ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর মধ্যে ম্যাঙ্গানিজের বৃহত্তম সঞ্চয় রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। তার পরেই ভারতবর্ষের স্থান। ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, মেক্সিকো, ব্রেজিল, চীন প্রভৃতি দেশ।

ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর সঙ্গে মানুষের পরিচয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘটেছে। তার আগে ম্যাঙ্গানিজ-যুক্ত খনিজ লোহার আকর বলে পরিচিত ছিল। প্লিনি তাকে চৌম্বক শক্তিহীন লোহার পাথর বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রাচীন ভারতের ধাতু-বিজ্ঞানীরা ম্যাঙ্গানিজের বিশেষ ধাতব সত্তার সঙ্গে পরিচিত না হয়েও লোহার আকর থেকে লোহা নিষ্কাশনের সময় ম্যাঙ্গানিজ-যুক্ত খনিজ ব্যবহার করতেন। জব্বলপুর জেলায় ঘোগরা নামে জায়গাটিতে ম্যাঙ্গানিজ-যুক্ত লোহার আকর থেকে কঠিন ইস্পাততুল্য লোহা নিষ্কাশন করা হত। স্থানীয় ভাষায় তাকে বলা হত "খেরি"। এই বিশেষ ধরনের ম্যাঙ্গানিজ-যুক্ত লোহা খুবই জনপ্রিয় ছিল স্থানীয় কর্মকারদের মধ্যে।

তা ছাড়া ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ম্যাঙ্গানিজের খনিজ গুঁড়ো করে চোখে লাগাবার সুর্মা তৈরি করা হত।

ম্যাঙ্গানিজের পুরাকালের ঐতিহ্য নেই — কিন্তু ভবিষ্যৎ রয়েছে ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে।

"ক্রোমিয়াম" নামে ধাতুর সংযোগে খুব কঠিন অদাগী ইস্পাত তৈরি হয়। দেশরক্ষার প্রয়োজনে ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাতের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। বুলেট-রোধক বর্ম তৈরি হয় এই ইস্পাত দিয়ে। ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদিতে এই ইস্পাতের আবরণ থাকে।

অদাগী ইস্পাত তৈরি করা হয় সাধারণ ইস্পাতে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে। অদাগী ইস্পাতের তৈজসপত্র বিশেষভাবে জনপ্রিয়।

ইস্পাতশিল্প ছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে ক্রোমিয়াম ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া ধাতু গলাবার চুল্লীতে তাপরোধক দেয়াল তৈরি করা হয় ক্রোমিয়াম দিয়ে।

"ক্রোমাইট" হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্রোমিয়ামযুক্ত খনিজ। ভারতবর্ষে তার ব্যাপক সঞ্চয় রয়েছে বিহার, উড়িষ্যা, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রে। এ দেশে ক্রোমাইটের অভাব কখনও ঘটবে না বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ক্রোমিয়ামের আবিষ্কার হয়। বহুকাল এই ধাতুটি কেবলমাত্র রাসায়নিকদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মিটিয়েছে — কোনও কাজে লাগানো হয় নি। বিংশতি শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইস্পাত শিল্পে ক্রোমিয়ামের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

ভারতবর্ষ ছাড়া তুরস্ক, রোডেশিয়া, নিয়াসাল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে ক্রোমাইট পাওয়া যায়।

টাঙস্টেন ইস্পাতের কাঠিন্যকে বহুগুণ বাড়ায় — ইস্পাতকে ভারিও করে তোলে। ভারি মেশিন তৈরি করতে টাঙস্টেনযুক্ত ইস্পাত দরকার হয়।

মূলত ইস্পাতশিল্পেই টাঙস্টেনের ব্যবহার। তা ছাড়া অঙ্গারকের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হয় টাঙস্টেন কার্বাইড। ড্রিলিং মেশিনে ভূস্তর বিদীর্ণ করার কাজে ব্যবহার করা হয় টাঙস্টেন কার্বাইড। বিজলী বাতির আলো বিকীরণকারী তার টাঙস্টেন দিয়েই তৈরি করা হয়। কাচ ও পোর্সিলেনকে হাল্কা হলদে রঙে রঙিন করে তোলে টাঙস্টেন। বিশেষ ধরনের রঙের পলেস্তারা তৈরি করতেও টাঙস্টেন লাগে।

সুইডেনের এ এফ কনস্টেড টাঙস্টেন আবিষ্কার করেন। ধাতুটি ভারি বলে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন "টাঙস্টেন"। সুইডিশ ভাষায় টাঙস্টেনের অর্থ হল ভারি পাথর।

টাঙ্গষ্টেনযুক্ত খনিজগুলির মধ্যে প্রধান হল "উলফ্রাম"। উলফ্রাম উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য চীন, যুক্তরাষ্ট্র, বলিভিয়া, কোরিয়া, পর্তুগাল, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ান কঙ্গো এবং কানাডা। ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত উলফ্রামের কোন উল্লেখযোগ্য সঞ্চয়ের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

ভারি যন্ত্রপাতিতে টাঙ্গষ্টেনযুক্ত ইস্পাতের অপরিহার্যতার দরুন এ দেশে টাঙ্গষ্টেনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে ক্রমশ। কিন্তু টাঙ্গষ্টেনের আকরের প্রয়োজনীয় প্রাচুর্য না থাকায় বিদেশ থেকে তা আমদানি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

যে সব যন্ত্রে খুব দ্রুত গতি সঞ্চারের প্রয়োজন হয়, সে সব যন্ত্রের জন্য লোহার সঙ্গে "ভ্যানেডিয়াম" নামে ধাতু মিশিয়ে বিশেষ ধরনের ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। ইস্পাতে দুর্বার শক্তি সঞ্চার করে ভ্যানেডিয়াম। ভ্যানডিয়ানের মধ্যে আছে ক্ষয়রোধক কাঠিন্য।

ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম ও টাঙ্গষ্টেনের মত ভ্যানেডিয়ামও মূলত ইস্পাত-শিল্পেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তার গৌণ ব্যবহার হয়ে থাকে সালফিউরিক অ্যাসিড, রঙ, বার্নিশ, ছাপার কালি ইত্যাদি তৈরি করতে এবং কাচকে নানা রঙে বিচিত্রিত করে তুলতে।

ধাতুদের মধ্যে ভ্যানেডিয়াম খুবই নবীন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তা আবিষ্কৃত হয়। সুইডেনের এন জি সেফষ্ট্রম ভ্যানেডিয়ামের নামকরণ করেছিলেন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সৌন্দর্যের দেবী ভানেডিসের নামে। ভ্যানেডিয়াম দিয়ে প্রস্তুত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থগুলির বিচিত্র বর্ণ ও সৌন্দর্য তাঁকে এই এই নামকরণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ভ্যানেডিয়ামযুক্ত খনিজের প্রাচুর্য রয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, পেরু, আফ্রিকার উত্তর রোডেশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাতে। ভারতবর্ষে সিংভূম জেলায় ধলভূম মহকুমার দক্ষিণ দিকে ভ্যানেডিয়ামের খনিজ পাওয়া যায়। এ দেশের বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলে ভূবিজ্ঞানীদের ধারণা।

ভ্যানেডিয়ামের খনিজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্যানোটাইট, রস্কোলাইট, ভ্যানেডিনাইট ইত্যাদি। ভারতবর্ষে সিংভূম জেলায় টাইটেনিয়াম নামক ধাতুযুক্ত ম্যাগনেটাইট বা চুম্বকপাথরের (চৌম্বক শক্তিযুক্ত পাথর) সঙ্গে মিশে আছে ভ্যানেডিয়াম।

প্রধানত যে সব ধাতু ইস্পাতকে ইস্পাতোত্তর করে তোলে—তাদের বিষয়ে আলোচনা করা হল। অধিকতর উৎকর্ষের দাবিতে ইস্পাতের সঙ্গে হয়তো অন্য কোনও ধাতুর সংমিশ্রণের প্রয়োজন হতে পারে ভবিষ্যতে। যন্ত্রের দাবিতে চরম ইস্পাতের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। যে ইস্পাতের উর্ধ্বে আর কোন ইস্পাত নেই, সেই ইস্পাতকে পেতে চান ধাতুবিজ্ঞানীরা। কিন্তু ইস্পাতকে পেরিয়ে যাবার উপায় নেই। যন্ত্র নির্মাণে ইস্পাতের স্থান নিতে পারে এমন কোনও ধাতু আবিষ্কৃত হয় নি।

॥ ১৩ ॥

বনের রহস্য

ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন ও ভ্যানেডিয়ম ছাড়া নিকেলের সঙ্গে লোহার সংমিশ্রণ ঘটিলেও বিশেষ ইস্পাত সৃষ্টি সম্ভব।

মিশ্র ইস্পাত নির্মাণে নিকেলের অবদান যতই হোক, এ দেশে আকরিক রূপে তার ভাণ্ডার এ পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল আমাদের কাছে। হঠাৎ নিকেলের এক অজ্ঞাত ভাণ্ডারের আভাস মিলল সুকিন্দার বনের অন্তরালে—বনের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল মাটির মধ্য প্রচ্ছন্ন এক পরম সম্পদ।

বন আমাদের মনকে টানে। ছোটনাগপুর ও তার পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলে শাল, মহুয়া, আসান, পিয়াশাল, কেঁদ, জাম, অর্জুন প্রভৃতি গাছের সমাবেশ আমাদের মুগ্ধ করেছে। পাথুরে জমিতে লালচে লোহাযুক্ত মাটির উপরে এই সব গাছের ফাঁকে ফাঁকে আমরা চিহোড়, কুরচি, বনপান, আতগুী প্রভৃতি লতাঝোপও দেখেছি। বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে যে শূন্যস্থান আছে, তাকে পূর্ণ করা শুধু নয়, গাছকে বেষ্টন করে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তারা। এই সব গাছ ও লতার সহাবস্থানের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু আছে বলে জানলেও আমরা তাকে গুরুত্ব দেই না। সৌন্দর্যের মূলে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থাকলেও তার পাশ কাটিয়ে যাই আমরা। কারণ আমাদের ধারণা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করে।

কিন্তু প্রকৃতির মোহন রূপের মূলে বিরাজ করছে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। গাছপালা ও লতাপাতার সমাবেশের বিচিত্র বিন্যাস মাটি ও পাথরের স্তরের রাসায়নিক উপকরণগুলির মিশ্রণের প্রতিবিম্ব ; অর্থাৎ মাটি বা পাথরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক উপকরণ, বিশেষ করে ধাতুর প্রাধান্য গাছপালার বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ রূপকে সম্ভব করে তোলে।

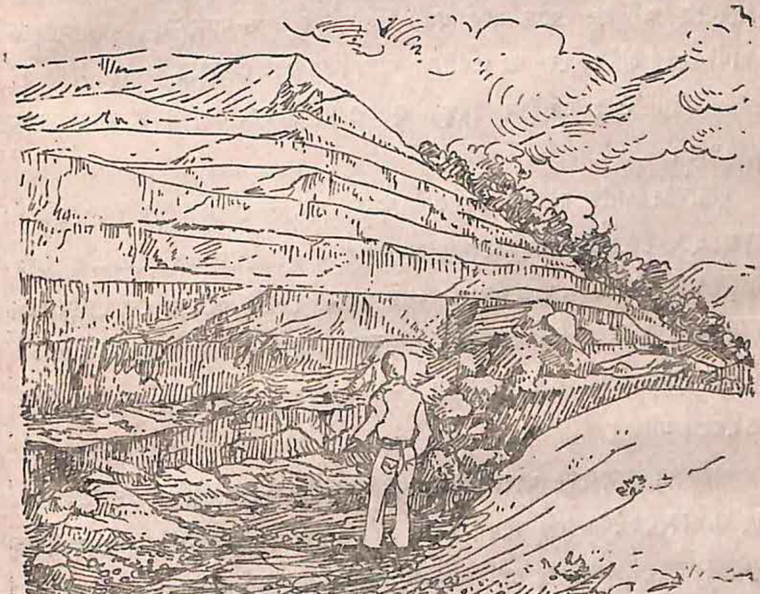
গাছপালা ও লতাঝোপের এক বিচিত্র বিন্যাসকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমি সুকিন্দার বনের মধ্যে। বনের বিন্যাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে এক বিস্ময়কর তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলাম। তত্ত্বের সঙ্গে অমূল্য ঐশ্বর্যেরও সন্ধান পেয়েছিলাম।

আমার সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলি।

তখন জানুয়ারী মাস। শীত প্রখর হলেও আবহাওয়া সুন্দর। ভূ-বৈজ্ঞানিক পরিক্রমার পক্ষে এম্নি আবহাওয়াই অনুকূল। নাগপুর থেকে দীর্ঘপথ গাড়ি দিয়ে উড়িষ্যার অন্তর্গত এই অরণ্য অঞ্চলে এসে পৌঁছেছি। জায়গাটি জাজপুর কেওঞ্ঝর রোড রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। দু-পাশে দুটি পরস্পর সমান্তরাল পাহাড়ের শ্রেণী। তাদের নাম দইতারি ও মহাগিরি। দুটি পাহাড়ের মাঝখানে জায়গাটি উপত্যকার মত বিন্যস্ত হয়ে আছে। কাছেই সুকিন্দাগড় শহর—প্রাক্তন 'সুকিন্দা' নামক করদ রাজ্যের রাজধানী। কাজেই উপত্যকাটির নাম দেওয়া হয়েছে সুকিন্দা উপত্যকা। 'ক্রোমাইট' (Chromite) খনিজের বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ার দরুণ উপত্যকাটি পৃথিবীশুদ্ধ ভূ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ক্রোমাইটের আকর্ষণে আমি ওখানে গিয়ে পৌঁছলেও আমার অনুসন্ধানের বিষয় হচ্ছে ক্রোমাইটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাথর। এই পাথর হচ্ছে আপেক্ষিক ঘনত্বের হিসাবে ভারী জাতের আগ্নেয় শিলা। এই আগ্নেয় শিলার স্বরূপ নির্ণয় করে তার মধ্যে কি কি ধাতু আছে, তার সন্ধান দেওয়াই ছিল আমার কাজ।

সরুয়াবিল নামে শবরদের একটি গ্রামের কাছে ক্যাম্প করে আছি। আমাদের ক্যাম্পের কাছে একটি ক্রোমাইটের খনি। মাটি ও ল্যাটেরাইটের (Laterite) আবরণ ভেদ করে এখানে ক্রোমাইট পাওয়া গেছে। ক্রোমাইটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আগ্নেয় শিলা ক্ষয় হয়ে এখানে ল্যাটেরাইটের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। কাজেই আগ্নেয় শিলার স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ নয় এখানে।

খনির বাইরে একটানা শুধু ল্যাটেরাইটের বিস্তার। ল্যাটেরাইটের নীচে কি আছে জানতে হলে খোঁড়াখুঁড়ি করা দরকার। খোঁড়াখুঁড়ি না করেও খোঁজাখুঁজি কি করে করা যায়, তা ভাবতে থাকি। ভাবতে ভাবতে ঘোরাঘুরি করি বনের মধ্যে। ঘন বন, বনের মধ্যে অধিকাংশই শালগাছ। শালগাছগুলি আকারে খুব বড়। এমন বড় আকারের শালগাছ ছোটনাগপুরের বনেও দেখি নি।



নিকেলযুক্ত খনিজের স্তর

বনকে দু-ভাগে ভাগ করেছে দামাসাল নদী। নদীর দক্ষিণ দিকের বন উত্তর দিকের বনের তুলনায় অনেক বেশী ঘন। নদীর উত্তর দিকের তুলনায় দক্ষিণ দিকের বন কেন বেশী ঘন, তা বোঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি যে, দক্ষিণে নানারকম লতাঝোপ আছে, যা উত্তর দিকে নেই। লতাঝোপগুলি বড় আকারের গাছগুলির মাঝখানকায় শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে বনের ঘনত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঘনত্বের জন্যে দক্ষিণের বনই আমার মনকে বেশী আকৃষ্ট করে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দক্ষিণের বন পরিক্রমা করি আমি।

বনের মধ্যে শালগাছ ছাড়া আছে আসান, পিয়াশাল ও কোংরা গাছ। বড় আকারের এই সব গাছের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে রকমারি লতাঝোপ। লতাগাছগুলিকেও চেনবার চেষ্টা করি। যে সব লতাগাছের প্রাধান্য চোখে পড়ে, তারা হচ্ছে কুরচি, খরসনা, খকুরা, বনপান ও আতগুী।

শালগাছের প্রাধান্যের দরুণ বনকে শালবন বলা চলে। বহু দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ শালবনকে অবিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। ল্যাটেরাইট ও ল্যাটেরাইটযুক্ত লাল্‌চে বাদামী রঙের মাটিকে যেন তা একটানা আচ্ছাদিত করে ফেলেছে।

অবিচ্ছিন্ন এবং একটানা বিস্তৃত হলেও বনের মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম দেখা যায়।

দামাসাল নদীর দক্ষিণে কয়েকটি স্থানে শালবন থেকে হঠাৎ শালগাছগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আসানগাছগুলি হয়ে গেছে খর্বাকৃতি এবং শাল-গাছের স্থান নিয়েছে আতগুীলতা। এমি ঘনঝোপ সৃষ্টি করেছে যে, দেখে মনে হচ্ছে যেন আতগুীলতারই বন। শালযুক্ত এবং খর্ব আসানযুক্ত এমি পাঁচটি আতগুীলতাবন আবিষ্কার করলাম। শালবনের সমুদ্রের মধ্যে তারা যেন দ্বীপের মত জেগে আছে।

একটানা শালবনের মধ্যে এই পাঁচটি আতগুী লতাবন রীতিমত রহস্যজনক। এই ব্যতিক্রমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজি। হাতের কাছে বইপত্র বিশেষ কিছু নেই, কাজেই আমার স্মৃতিশক্তির শরণাপন্ন হই। উদ্ভিদতত্ত্ব সংক্রান্ত পড়াশুনা আমার খুবই সামান্য। কাজেই স্মৃতি মন্থন করে বিশেষ লাভ হয় না। অগত্যা আমার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সমস্যাটির সমাধান করতে চেষ্টা করি।

প্রথমে মনে হলো, এই পাঁচটি অঞ্চলে স্থানীয় আদিবাসীরা হয়তো শালবন পুড়িয়ে জুম চাষ করেছে। জুম চাষের হিসাব নিকাশ সরকারী বন বিভাগের কাছে থাকে, কাজেই সুকিন্দাগড়ে গিয়ে ফরেষ্ট রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করলাম।

নথিপত্র ঘেঁটে ফরেষ্ট রেঞ্জার আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সুকিন্দা উপত্যকার মধ্যে এই শালমুক্ত আতগুী লতাবনগুলিতে শালগাছ নেই বলে আদিবাসীরা জুম চাষ করেছে। শালবনেও মাঝে মাঝে করেছে তারা জুম চাষ। কিন্তু তার জন্যে শালগাছ কাটে নি তারা কখনো। সুকিন্দার বনাঞ্চলের শালগাছগুলি

বন বিভাগের কঠোর নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে। তাদের কেটে ফেলবার অধিকার কারোরই নেই।

অতএব আতণ্ডী লতাবন পাঁচটির শালমুক্ত হওয়ার মূলে জুম চাষের যে কোন অবদান নেই, তা বুঝতে পারলাম। জুম চাষ বা শালগাছ নিধন নয়, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই বনের পাঁচটি অঞ্চল থেকে শালগাছগুলি নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি সেই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ? তা কি কোন রকম মড়ক ? কিন্তু এমন কোন মড়ক কি সম্ভব, যা শুধু বেছে বেছে শালগাছগুলিকেই আক্রমণ করবে ?

অনেক চিন্তা করেও এ ধরণের কোন মড়কের কথা ভেবে পেলাম না।

মড়কের বিকল্পে তেজস্ক্রিয়তার কথা মনে হলো। মাটির নীচে হয়তো এমন কোন তেজস্ক্রিয় (Radio-active) খনিজ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছে, যা থেকে বিকীর্ণ তেজস্ক্রিয়তা শালগাছগুলিকে সংহার করেছে।

কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার এমন পক্ষপাতপূর্ণ সংহারলীলা কি সম্ভব ? অর্থাৎ বেছে বেছে শুধু শালগাছগুলিকে বিনষ্ট করবে, এ হেন তেজস্ক্রিয়তা কি কোথাও আছে ?

তেজস্ক্রিয়তার তত্ত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান আমার সীমাবদ্ধ হলেও তার এহেন পক্ষপাত-মূলক আচরণ আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। অতএব বুঝলাম যে, এ-রহস্যের মীমাংসা তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মত রহস্যটি সমাধানের একটি সূত্র আমার মনে এল।

মাটি বা ল্যাটেরাইটের মধ্যে হয়তো এমন কোন রাসায়নিক উপাদান বা ধাতু রয়েছে, যা শাল ও আসানগাছের কাছে বিষাক্ত। তা শালগাছকে নিশ্চিহ্ন করে আসানগাছগুলিকে করে তুলেছে খর্বাকৃতি। তা আতণ্ডীলতার কোন ক্ষতিসাধন করে নি, কারণ আতণ্ডীলতার কাছে হয়তো ঐ বিষ অমৃতবৎ।

শাল ও আসানগাছের কাছে বিষ, অথচ আতণ্ডীলতার কাছে অমৃতবৎ ধাতুটির স্বরূপ নির্ণয় করবার জন্যে শালমুক্ত অঞ্চলগুলি থেকে মাটি ও ল্যাটেরাইটের নমুনা সংগ্রহ করলাম। শালমুক্ত প্রতিটি অঞ্চল থেকে এক-শ' ফুট অন্তর অন্তর অনেকগুলি করে নমুনা খুঁড়ে বের করা হলো। তারপর তাদের অ্যালকাথিনের ব্যাগে পুরে নাগপুরে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে পাঠালাম।

এরপর চলে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। অবশেষে এল রাসায়নিক পরীক্ষার

রিপোর্ট। রিপোর্ট মানে মাটি ও ল্যাটেরাইটে প্রচ্ছন্ন ধাতুগুলির শতকরা পরিমাণের তালিকা।

তালিকাটি এক নজরে দেখেই চমকে উঠি। লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের পাশাপাশি নিকেলের শতকরা পরিমাণ দেওয়া আছে। গড়পড়তা যতটা নিকেল থাকা উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশী। মাটি ও ল্যাটেরাইটের মধ্যে এতখানি নিকেলের সমাহরণ (Concentration) মাটির নীচে নিকেলযুক্ত খনিজের ভাণ্ডারের নির্দেশ দিচ্ছে।

রিপোর্টটা পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠি। মাটি ও ল্যাটেরাইটের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নিকেলই যে শাল ও আসানগাছের কাছে বিষবৎ হয়ে উঠে শালগাছকে নিশ্চিহ্ন এবং আসানগাছকে খর্বাকৃতি করে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না আমার। আতগুীলতার কাছে অবশ্য এই বিষ অমৃততুল্য হয়ে উঠেছে এবং তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

নিকেলের প্রভাবে শালগাছের বিনাশ এবং আতগুীলতার শ্রীবৃদ্ধি, অতএব শালমুক্ত এবং আতগুী লতাযুক্ত বনাঞ্চলে নিকেলের ভাণ্ডার প্রচ্ছন্ন থাকবার সম্ভাবনা।

এই সম্ভাবনার প্রেরণায় নিকেলের জন্যে সমীক্ষা সুরু করা হলো শালমুক্ত বনাঞ্চল পাঁচটিতে। সমীক্ষা মানে খোঁড়াখুঁড়ি, ড্রিলিং (Drilling) ও জরিপ। পাঁচটি অঞ্চলেই মাটির আবরণের আড়ালে নিকেলের বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হলো।

শালমুক্ত বনের রহস্যভেদ করতে গিয়ে অতুলনীয় ঐশ্বর্যের সন্ধান মিলল।

॥ ১৪ ॥

শ্রেয়সী

নিকেলের সঙ্গে সহাবস্থান করছে কোবাল্ট (cobalt)। তা ছাড়া প্লাটিনামেরও সম্ভাবনা রয়েছে। সুকিন্দার নিকেলযুক্ত খনিজের সঙ্গে প্লাটিনামের লক্ষণ দেখা দেওয়াতে ভূতাত্ত্বিকরা উৎসাহিত বোধ করছেন।

এখন এই প্লাটিনামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই আপনাদের কাছে।

যত কালো, তত ভারি—প্রস্তরবিহারী ভূবিদ্‌দের এই অভিজ্ঞতা। সাদা বা ফিকে লাল রঙের গ্র্যানিট (granite) পাথর পৃথিবীর বাইরের কঠিন কাঠামোর ওপরতলায় বিরাজ করছে। তার নীচে আছে কালোয় সাদায় মেশানো ডায়োরাইট (diorite) ও গ্র্যানোডায়োরাইট (granodiorite)। শিলাস্তরের বিন্যাসে যেমন তা মধ্যবর্তী, আপেক্ষিক গুরুত্বের হিসাবেও তার স্থান মাঝামাঝি। তার নীচে কালো ব্যাসল্ট (basalt), গ্যাব্রো (gabro), নরাইট (norite), পেরিডোটাইট (peridotite), ডুনাইট (dunite) ইত্যাদি কালো পাথরের গুরুভার। পাথরের রাজত্বে তাদের ভার সর্বচেয়ে বেশি এবং কালিমা গাঢ়তম।

বৈজ্ঞানিকরা কালোকে কালো বলে অবহেলা করতে পারেন না। কালো তা সে যতই কালো হোক তার অন্তর্নিহিত রহস্যভেদের চেষ্টা করেন তাঁরা। ডুনাইট জাতীয় ভারি পাথরের ঘন নিবিড় কালোর মধ্যে আলোর সন্ধান পেয়েছেন ভূ-বিজ্ঞানীরা। এই আলো হল প্লাটিনাম। রঙ তার শাদা। তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতার তুলনা ভূ-প্রকৃতির মধ্যে কোথাও নেই। রূপে-গুণে অতুলনীয়। ধাতু হিসেবে সোনার চেয়েও সেরা। বস্তু জগতে শ্রেয়সীর শিরোপা পেতে পারে।

কানাডার সাডবেরি (Sudbury) অঞ্চলে ভারি কালো পাথরের পুঞ্জে পুঞ্জীভূত নিকেল-তামার আকর পাওয়া যায়। এখানে বড় বড় খনি গড়ে উঠেছে। নিকেল-তামা ছাড়া আর কোনও খনিজ সম্পদের অস্তিত্ব এখানে ভূতত্ত্ববিদ্‌দির দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। নরাইট (norite) শ্রেণীর পাথরের গাঢ় কালো রঙ প্লাটিনামের আলোকে চাপা দিয়ে রেখেছিল।

কালোর আবরণ ভেদ করে ভূ-বিজ্ঞানীরা এই আলোতে উপনীত হলেন বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে নিয়মিত সাডবেরি থেকে প্লাটিনাম আহরণ করা হচ্ছে। এখানে প্লাটিনামের উৎপাদন উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে তৃতীয় দশকে। এই সময় প্লাটিনাম উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল কানাডা।

কানাডায় যখন প্লাটিনাম আবিষ্কৃত হয়, তখন রাশিয়ার য়ুরাল পর্বতে প্লাটিনামের উৎপাদন চলেছে। বিগত একশ পঁচিশ বছর ধরে য়ুরাল পর্বতের

পর্মে জেলার নদীগুলির ধারাপথে সঞ্চিত বালির দানা থেকে প্লাটিনামের কণা আহরণ করা হয়েছে। এই প্লাটিনাম প্রথমে ডুনাইট শ্রেণীর পাথরে প্রোথিত ছিল। প্রায় দশ বছর আগে য়ুরাল পর্বতমালা জুড়ে হিমবাহের রাজত্ব ছিল। হিমবাহের প্রবাহে নদীর মত চপল গতি না থাকলেও ভার আছে। অনেকটা স্টীম রোলারের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। ধীরগতিতে চলতে চলতে প্রবাহ-পথে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। অনেক তুঙ্গ পর্বত শিখরের শীর্ষ দশ লাখ বছর আগেকার হিমবাহের আঘাতে ক্ষয় পেয়েছিল। এই ক্ষয়ের ফলে য়ুরালের পাথরের কাঠামোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্লাটিনাম বেরিয়ে এসেছিল এবং হিমবাহ থেকে উদ্ভূত নদীর ধারাপথে সঞ্চিত হয়েছিল। ওজনে খুব ভারি বলে সঞ্চিত খনিজ-কণার স্তূপের একেবারে নীচে সে তার স্থান করে নিয়েছিল। প্রায় একশ পঁচিশ বছর আগে প্লাটিনামের এই ভাণ্ডারটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘকাল ধরে এখান থেকে প্লাটিনাম সংগ্রহ করা হয়েছে। প্লাটিনামের মূল উৎসের দিকে দৃষ্টি পড়ল অবশ্য আরও অনেক পরে। য়ুরাল পর্বতে প্লাটিনামের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে একটানা প্রায় এক শতাব্দী ধরে প্লাটিনাম উৎপাদনে রাশিয়া অগ্রগণ্য ছিল।

রাশিয়াতে প্লাটিনামের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ার আগে দক্ষিণ আমেরিকার চেকো জেলা প্লাটিনামের চাকচিক্যে ঝলমল করত। চেকো জেলার সান জুয়ান এবং আত্রাতো নদীর বালিতে ক্রোমাইট (chromite), ডুনাইট, পাইরোক্সিনাইট (pyroxenite) প্রভৃতি খনিজ ও পাথরের কণার সঙ্গে প্লাটিনামের দানা মিশে আছে। রাশিয়ার য়ুরাল পর্বতে প্লাটিনামের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত সান জুয়ান ও আত্রাতো নদীর বালিই পৃথিবীব্যাপী প্লাটিনামের চাহিদা মেটাত।

কোলাম্বিয়ার প্লাটিনাম যখন অজ্ঞাত ছিল, তখন প্লাটিনামকে দুর্লভ সম্পদ বলে ধরা হয়েছিল। প্রায় চারশ বছর আগে এক স্পেনীয় দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর দল দক্ষিণ আমেরিকার পিন্টো নামে নদীর তীরে প্লাটিনাম আবিষ্কার করেছিলেন। তার শুভ্রতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁরা ভাবছিলেন বুঝি রূপা আরও রূপবতী হয়ে বিরাজ করছে। তাই তাঁরা এই ধাতুটির নাম দিয়েছিলেন প্লাটিনা ডেল পিন্টো (platine del pinto)। প্লাটিনা শব্দটি প্লাটার (plata) অপভ্রংশ। স্পেনীয় ভাষায় প্লাটার অর্থ হল রূপা। আর পিন্টো

হল দক্ষিণ আমেরিকার সেই নদীটির নাম, যার বালিতে সোনার দানার সঙ্গে প্লাটিনাম অবস্থান করছে।

প্লাটিনামের সব কটি ভাণ্ডারের দরজা এখন পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়নি। প্লাটিনাম কোথায় আছে কোথায় নেই, কোন দেশ প্লাটিনামের সম্পদে পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম, তা বলার পালা এখনো আসেনি। কারণ প্লাটিনামের উৎপাদনে পালাবদল ঘন ঘন হচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন কোলাম্বিয়াতে প্লাটিনাম উৎপাদিত হত, তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্লাটিনামের ভাণ্ডার অজ্ঞাত ছিল। উনবিংশতি শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রাশিয়ার য়ুরাল পর্বতের প্লাটিনাম জগৎ-চক্ষুর গোচরে আসামাত্র কোলাম্বিয়ার চোকো জেলার চাকচিক্য নিষ্প্রভ হল এবং প্লাটিনামের ক্ষেত্রে রাশিয়ার জয়যাত্রা শুরু হল। প্লাটিনামের উৎপাদনে রাশিয়া যখন আধিপত্য করছে, তখন কানাডার সাডবেরির কালো পাথরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল প্লাটিনামের অতুল সম্পদ। তার খবর যখন মিলল, সাডবেরির কালো থেকে আলো যখন বেরিয়ে এসে সকলের চোখে চমক লাগাল, তখন য়ুরালের সিংহাসন টলল, শেষ হল রাশিয়ার প্লাটিনামে আধিপত্যের পালা।

গত চল্লিশ বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী প্লাটিনামের মোট উৎপাদনের অধিকাংশ কানাডা থেকে এসেছে। ইতিমধ্যে রাশিয়া ও কোলাম্বিয়া প্লাটিনামের উৎপাদনে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে, অন্য কোনও দেশ যে প্লাটিনামের উৎপাদনে কানাডার সমকক্ষ হতে পারবে, তা কেউ ভাবেনি। এমন সময় অকস্মাৎ প্লাটিনামের ভাণ্ডারের রশ্মিপাত করে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় সব দেশেরই, কানাডাও কানা হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল জেলার মাঝামাঝি জায়গায় কালো ভারি পাথরের স্তূপের মধ্যে প্লাটিনামের অস্তিত্ব জানা থাকলেও তার গুপ্ত ভাণ্ডারের পরিমাণ পুরোপুরি অজ্ঞাত ছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শুরু হল এই কালো পাথরের মধ্যে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা। তার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, ট্রান্সভাল জেলার কালো পাথরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে অতি বৃহৎ প্লাটিনামের ভাণ্ডার। গত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে প্লাটিনামের উৎপাদনে দক্ষিণ আফ্রিকা অগ্রগণ্য হয়েছে।

সাম্প্রতিক সমীক্ষার ফলে পশ্চিম ইথিয়োপিয়া, জাপান, সিয়েরা লিয়োন, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্লাটিনামের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভারতেও প্লাটিনামের সন্ধান চলছে। মণিপুর, উড়িষ্যা, বিহার, মহারাষ্ট্র, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে পাইরোক্সিনাইট, পেরিডোটাইট ও ডুনাইট শ্রেণীর কালো ভারি পাথরের স্তূপ রয়েছে। তাদের মধ্যে প্লাটিনামের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞানীরা।

প্লাটিনাম নামটি একটি মাত্র ধাতু বোঝালেও তা আসলে একাধিক ধাতুর একটি শ্রেণী। প্লাটিনামের পরিবারে সমশ্রেণীর দুটি গোষ্ঠী রয়েছে। একটি হল প্লাটিনাম গোষ্ঠী—অন্যটি প্যালাডিয়াম (palladium)। প্লাটিনাম গোষ্ঠীতে রয়েছে প্লাটিনাম, ইরিডিয়াম (iridium) প্রভৃতি এবং প্যালাডিয়াম গোষ্ঠীতে বিরাজ করছে প্যালাডিয়াম, রোডিয়াম (rodium) প্রভৃতি। বলা বাহুল্য গোষ্ঠী দুটির গোষ্ঠীপতি হল প্লাটিনাম এবং প্যালাডিয়াম এবং প্লাটিনাম পরিবারে তাদেরি কদর ও চাহিদা বেশি।

প্লাটিনামের প্রধান আকর্ষণ তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা। সোনার চেয়েও দামী ও সোনার মতই টেকসই বলে তা টাকশালে স্থান পেয়েছিল রাশিয়ার জারের নির্দেশে। ১৮২৮ থেকে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আঠার বছর প্লাটিনাম দিয়ে রুবল তৈরি করা হত। কিন্তু প্লাটিনাম মূল্যের মানে রুবলের দাম চড়া হয়ে ওঠাতে রুবল থেকে প্লাটিনাম প্রত্যাহৃত হল। প্লাটিনামের রাসায়নিক ক্ষয় নিরোধ ও উচ্চমাত্রার তাপ সইবার অসাধারণ ক্ষমতার দরুণ নানাপ্রকার রাসায়নিক শিল্পে তার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। রাসায়নিক শিল্প ছাড়া বৈদ্যুতিক শিল্পেও প্লাটিনাম শ্রেণীর ধাতু অপরিহার্য।

রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক শিল্পের চেয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক কারুশিল্পে প্লাটিনামের ব্যবহার। সোনার চেয়েও নমনীয় বলে প্লাটিনামের পটে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলঙ্করণ সম্ভব। যে সূক্ষ্ম কারুকার্য প্লাটিনামে ফুটিয়ে তোলা যায় তা সোনাতে সম্ভব নয়। প্লাটিনাম দিয়ে প্রস্তুত জড়োয়া গহনা সোনাকেও হার মানায়। প্লাটিনামের শুভ্রতা হীরার জৌলুসকে পুরোপুরি পরিস্ফুট করে তোলে য়ুরোপ ওআমেরিকায় তাই প্লাটিনাম বসানো হীরার গয়নার খুব সমাদর।

আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে অবশ্য প্লাটিনামের গয়নার তেমন সমাদর নেই। প্লাটিনামের শুভ্রতার চেয়ে সোনার সোনালী রঙ তাদের বেশি পছন্দ। কিন্তু পশ্চিমের বিদেশিনীদের কাছে প্লাটিনামের তুলনা নেই, তাদের চোখে প্লাটিনামই সব ধাতুর সেরা।

॥ ১৫ ॥

নতুন যুগ নতুন ধাতু

প্লাটিনাম বা সোনার মত মূল্যবান নয়, লোহা বা তামার চেয়েও তার দাম কম—কিন্তু প্রয়োজনের নিরিখে এখন সবচেয়ে দরকারী ধাতু হতে চলেছে অ্যালুমিনিয়াম।

অ্যালুমিনিয়মের আকর বক্সাইট-এর (bauxite) একটি বিপুল ভাণ্ডার দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার অমরকণ্টক পাহাড়ে গিয়ে।

নর্মদা ও শোনের উৎস দেখতে গিয়েছিলাম মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টকে। মহাকাল (মেকল) পর্বতের পূর্বপ্রান্তে অমরকণ্টক—সমুদ্রের সমতল থেকে মাপলে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু। পেনড্রা, অনুপপুর ও গাডোলের সমতল-ভূমি থেকে দেখলে মনে হয় যেন আকাশ মাটির সঙ্গে বাঁধা পড়েছে বিপুল সেতুবন্ধনে—মাটি নিজের সীমা অতিক্রম করে উধাও হয়েছে আকাশপানে। মনে হয়, পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে আকাশকে যেন ছুঁতে পারব।

ঘন বনে পাহাড়টি আচ্ছন্ন। সবুজের ঠাসবুনানিকে একটু দূর থেকে ধূসর দেখায়। পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সবুজের আড়ালে পাহাড়ের কঙ্কালটিকে দেখলাম। জমাট বাঁধা কালো পাথরের স্তূপ। গাড়ি থামিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, থরে থরে সাজানো ব্যাসল্ট। আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত লাভা থেকে ব্যাসল্টের সৃষ্টি। ব্যাসল্ট আগ্নেয়গিরির দান। প্রায় তিন থেকে পাঁচ কোটি বছর আগে, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে ব্যাপক অগ্নিপ্রবাহ ঘটেছিল। অমরকণ্টকেও পৌঁছেছিল সেই আগুনের স্রোত।

পাষাণপুঞ্জের কঠিন কাঠামো লঙ্ঘন ক'রে উত্তীর্ণ হ'লাম মৃত্তিকার কোমল আশ্রয়ে। পাহাড়ের শীর্ষে এসে দেখি পশ্চিমদিকে বিস্তৃত সবুজ অধিত্যকা। নরম কালো মাটির ওপরে কোমলতর ঘাসের আচ্ছাদন। পাথর ঢাকা পড়েছে মাটির আড়ালে। পাথরের প্রচ্ছন্ন আধার থেকে মাটির আবরণ ভেদ ক'রে এখানে নর্মদার আত্মপ্রকাশ। উৎস থেকে ক্ষীণ জলের ধারা মাটিকে বিশ্লিষ্ট

ক'রে পশ্চিমদিকে ব'য়ে যাচ্ছে। একটি নদীর ক্ষীণ সূচনা সবুজ স্বাক্ষরে চিহ্নিত। দেখে চোখ জুড়োয়।

কালো পাথরের ওপরে কালো মাটি। পাথরের কাঠিন্য এসে মিশেছে মাটির কমনীয়তায়। দুয়েরই মূলে র'য়েছে কোটি কোটি বছর আগেকার ব্যাপক অগ্নি অবগাহন। সেই আগুন নিভেছে, কিন্তু তার চিহ্ন র'য়ে গেছে প্রতিটি পাথর ও মাটির কণায়।

নর্মদার ধারা দু' পাশে শ্যামল সরসতা বিকীর্ণ করছে। অসমতল ভূচিত্রের রুক্ষতা চোখ জুড়নো সবুজে ক'রেছে আত্মগোপন। কিন্তু এই মোহন রূপ যে একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অগ্নিস্নানের ফল, আমাদের মুগ্ধ মন কী তা' স্বীকার করবে!

নর্মদার প্রবাহ অনুসরণ ক'রে দেখে এলাম কপিলধারা ও দু-ধারা জল-প্রপাত। প্রপাত দুটির বেগের আবেগে মাটির আবরণ বিশ্লিষ্ট হ'য়ে কালো ব্যাসল্টের স্তূপকে উদ্ঘাটিত করেছে। পাথরের নিবিড় কালিমাকে কোন্ এক অদৃশ্য শিল্পী যেন রূপালী রেখায় চিত্রিত করতে চাইছেন। কিন্তু কালো পাথরে রঙ ধরছে না। রূপালী রঙের ধারা শিল্পীর তুলি থেকে উপচে গড়িয়ে পড়ছে কোন অনুশাসন না মেনে।

জলের রূপালী স্রোত পাথরে চিত্রিত না হ'লেও চিহ্নিত হয় গভীরভাবে। পাথরের কঠিন সংহতিকে বিশ্লিষ্ট করে জলের ধারালো ধারা।

কালো ব্যাসল্টের ক্ষয়কে অনুসরণ ক'রে কালো মাটিতে হ'লাম উপনীত। ব্যাসল্টের ক্ষয়ের পরিণতি কালো মাটি। কালো ব্যাসল্টের সঙ্গে কালো মাটি ছাড়া অন্য কিছুর সহাবস্থান আমার ধারণায় এল না।

অবশ্য আমার ধারণা বদলাল নর্মদার উৎসের উত্তরদিকে কবীর চবুত্‌রায় গিয়ে। একটি নালার ধারে বাঁধানো বেদী। বেদীকে হিন্দীতে বলে 'চবুত্‌রা'। সন্ত কবীর নাকি এখানে ব'সে সাধন-ভজন করতেন। কাজেই কবীরের নামে নামকরণ হ'য়েছে বেদীটির।

নালার ধারে ছায়ায় ঘেরা জায়গাটি। সড়ক ছেড়ে উৎরাই বেয়ে অনেক-খানি নেমে এসে সেখানে উপনীত হওয়া যায়। 'চবুত্‌রার' কাছে চড়াইয়ের গায়ে গুহার মধ্যে একজন সন্ন্যাসী থাকেন।

জায়গাটি আমাদের ভাল লাগল। সেখানে ব'সে আমরা বৈকালিক চা-

পানের আয়োজন করি অমরকন্টকের বিশ্রামগৃহ থেকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিলাম।

ইতস্তত ছড়ানো পাথর জড়ো ক'রে জল গরম করার ব্যবস্থা করা হয়। পাথরগুলোর লালচে খয়েরী রঙ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যাসল্টের কাঠিন্য নেই তাদের—খানিকটা মেটে ভাব।

পরখ ক'রে বোঝা গেল যে, পাথরগুলো 'ল্যাটেরাইট (laterite)'। ব্যাসল্টেরই ক্ষয়ের অবশেষ। জল ও জলীয় বাষ্পের রাসায়নিক ক্রিয়ায় ব্যাসল্ট থেকে অন্যান্য পদার্থ অপসৃত হ'য়ে অবশিষ্ট থেকেছে লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে। লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের মিশ্রণ এই ল্যাটেরাইট। ল্যাটিন ভাষায় 'later' শব্দের অর্থ ইট। ল্যাটেরাইটের চেহারা অনেকটা ইটের মত। ল্যাটেরাইটকে গৃহ-নির্মাণের উপকরণ হিসেবে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার করা হয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। অনেক জায়গায় এখনো ঘর বাড়ি তৈরি করতে ল্যাটেরাইট ব্যবহার করা হয়।

কবীর চবুত্রার আশেপাশে ব্যাসল্টের ওপরে ল্যাটেরাইটের স্তূপ দেখলাম। কালো মাটির মতই ব্যাসল্টকে তা' ঢেকে রেখেছে।

ল্যাটেরাইটের রঙ জায়গায় জায়গায় ফিকে হ'য়েছে। লালচে খয়েরী থেকে হলদে। মেটে ভাবটা অবশ্য অপরিবর্তিত। রঙের সঙ্গে মূল স্বরূপও বদলেছে। হলদে রঙের চক্রাকৃতি পিণ্ডের সমাহার ল্যাটেরাইটের সগোত্র হ'লেও পার্থক্যের আভাস দেয়। রাসায়নিক ক্ষয় প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকলেও ল্যাটেরাইটের অন্তর্নিহিত লোহা খুব উত্তপ্ত পরিবেশে জল বা জলীয় বাষ্পের ক্রিয়ায় গ'লে যেতে পারে। লোহা স'রে গেলে প'ড়ে থাকে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়ামে সমৃদ্ধ ল্যাটেরাইটকে বলে 'বক্সাইট (bauxite)'। বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন হয়।

অ্যালুমিনিয়াম মাটি এবং বহু খনিজ ও পাথরের স্তরের অন্তর্নিহিত একটি সাধারণ উপকরণ। লোহার মতই প্রকৃতিতে এর প্রাচুর্য। কিন্তু বক্সাইট ছাড়া অন্য কোনও খনিজ থেকে এর নিষ্কাশন সম্ভব হয় নি। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় বক্সাইটকে বিশ্লিষ্ট করে অ্যালুমিনিয়ামকে আলাদা করা হয়।

অমরকণ্টক পাহাড়ের ওপরে ল্যাটেরাইটের সঙ্গে সহাবস্থান করছে বক্সাইট। বক্সাইটের জন্য এখানে ভূতাত্ত্বিক পরিক্রমাও চলছে। কবীর চবুত্রার কাছাকাছি একটি সরকারী বিশ্রামগৃহে ডেরা বেঁধে একদল ভূবিদ্ অমরকণ্টকের কতখানি বক্সাইট পরিবৃত তার পরিমাপ করছেন। এ অঞ্চলে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা বসাবার পরিকল্পনা আছে ব'লে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

আমাদের দেশে বক্সাইটের অভাব নেই। রাঁচি, পালামৌ, সম্বলপুর, উড়িষ্যা ও অন্ধ্র প্রদেশের পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশূর, মাদ্রাজ ও জম্মুর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাসল্টের সঙ্গে সহাবস্থান করছে বক্সাইট। কোটি কোটি বছর আগেকার আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্বাক্ষরকে বহন করছে তা'।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের লে বক্স্ নামে একটি জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে করতে একটি বক্সাইটের স্তূপ পি বার্থিয়ে নামে জনৈক বিজ্ঞানীর চোখে পড়ে। অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটিকে তখন কেউ চিনত না। বক্সাইটের মধ্যে যে একটি বিশেষ ধাতুও উহ্য রয়েছে পি বার্থিয়ে তা জানতেন না। তথাপি বক্সাইট নামে খনিজটির আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁরই। লে বক্স্ নামে গ্রামের নাম অনুসারে খনিজটির নামকরণ হ'ল।

পি বার্থিয়ে কর্তৃক বক্সাইট আবিষ্কারে চার বৎসর পরে বক্সাইট থেকে প্রথম অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়। তখন পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগের কৌশল জানা ছিল না। রাসায়নিক পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হ'য়েছিল। রাসায়নিক পদ্ধতিটি ব্যয়সাপেক্ষ ও জটিল বলে বেশি পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন সম্ভব ছিল না। কাজেই তা' জন-সাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হ'তে পারে নি তখন।

ল্যাটিন অ্যালুমেনের নামে অ্যালুমিনিয়ামের নামকরণ হ'য়েছিল। অ্যালুমেন হ'ল পাথুরে ফটকিরি (alum), বা খনিজ হিসেবে পাওয়া ফটকিরি। ফটকিরি অ্যালুমিনিয়াম-যুক্ত একটি রাসায়নিক পদার্থ। ধাতুদের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম খুবই আধুনিক। উনবিংশতি শতাব্দীর আগে অ্যালুমিনিয়াম মানুষের কাছে অপরিচিত ছিল। প্রকৃতির বুকে প্রায় লোহার মত প্রাচুর্য হ'লেও অ্যালুমিনিয়ামকে চিনতে সময় লেগেছে, খনিজ থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন সহজ ছিল না ব'লে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের প্রদর্শনীতে অ্যালুমিনিয়াম প্রদর্শিত হওয়ার পর সাধারণ লোকেরা অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে পরিচিত হ'ল। অন্যান্য ধাতুর চেয়ে ওজনে হাল্কা, মনোরম রূপালী রঙের ধাতুটি সকলের মনোহরণ করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অসংখ্য সম্ভাবনার কথা সকলে ভাবতে শুরু করে।

কিন্তু ধাতুটি উৎপাদনের সহজ ও সুলভ পদ্ধতি তখনো অজ্ঞাত ছিল বৈদ্যুতিক শক্তি তখন পর্যন্ত আয়ত্তের মধ্যে আসে নি ব'লে। ধাতুবিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বক্সাইটের বন্ধন থেকে অ্যালুমিনিয়ামকে মুক্ত করার একমাত্র সহজ ও সুলভ উপায় হ'ল বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যুৎ উৎপাদনী যন্ত্র (dynamo) আবিষ্কার হওয়ার পর বিদ্যুৎ দিয়ে বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা শুরু হ'তে থাকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে। তারপর ক্রমশ অন্যান্য দেশেও অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন হ'তে থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, ভারত, পশ্চিম জার্মানি, নরওয়ে ও জাপানে পৃথিবীর অধিকাংশ অ্যালুমিনিয়মের উৎপাদন হ'য়ে থাকে।

অ্যালুমিনিয়াম লোহা ও ইস্পাতের মতই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ধাতু। প্রায় একশ বছর আগে অ্যালুমিনিয়াম ছিল না, কিন্তু এখন অ্যালুমিনিয়াম না হলে চলে না। হাল্কা বলে উড়ো জাহাজের প্রায় সব কিছু অ্যালুমিনিয়াম দিয়েই প্রস্তুত হয়। তার এঞ্জিনও। ট্যাঙ্কারের পেট্রোল ধরে রাখার আধারও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে প্রস্তুত। মোটর গাড়ি ও যুদ্ধের ট্যাঙ্কে অ্যালুমিনিয়াম আবশ্যিক উপকরণ। য়ুরোপ ও আমেরিকায় অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে দ্রুতগামী যাত্রিবাহী রেল গাড়ি তৈরি করা হয়। পাইপ, ভ্যাকুম ক্লিনার, রেফ্রিজারেটার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাপারে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে অতিক্রম করে মহাকাশে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চাই হাল্কা যন্ত্রপাতিযুক্ত রকেট। মহাকাশে বিচরণের জন্য যে লঘুতার প্রয়োজন, রকেট তৈরিতে অ্যালুমিনিয়ামকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করলে তা পাওয়া যেতে পারে। মহাশূন্যে পরিক্রমা করে গ্রহান্তরে উপনীত হওয়ার দিন আগত। পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে গ্রহমণ্ডলে আত্মপ্রসারের পরিকল্পনা করেছে মানুষ। এই পরিকল্পনার মধ্যে অপরিহার্যভাবে স্থান নিয়েছে অ্যালুমিনিয়াম

মানুষের ভাবী সভ্যতার বাহন হবে অ্যালুমিনিয়াম। হয়তো অচিরে লোহা ও ইস্পাতকে অতিক্রম করে মানুষের সভ্যতায় অ্যালুমিনিয়ামের যুগ এসে যাবে।

অ্যালুমিনিয়ামকে আমাদের ঘরে ঘরে অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে পেয়েছি আমরা। গৃহস্থালীর অত্যাবশ্যক উপকরণগুলির মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম জায়গা করে নিয়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের বাসন ছাড়া আমাদের চলে না। অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি, থালা, গেলাস, টিফিন কেরিয়ার, গামলা, কেটলি ইত্যাদি আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

কবীর চবুত্‌রার পাশে পাথর জড়ো করা উনুনে আমরা চায়ের জল গরম করি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে। চায়ের পর্বেও অ্যালুমিনিয়াম অপরিহার্য্য।

অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রটি পুরোনো, বহু ব্যবহারে কালিমালিপ্ত। কিন্তু তবু তা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে একজন 'বাইগা' যুবকের। সে ও তার স্ত্রী সন্ন্যাসীর গুহার পাশে আস্তানা নিয়েছিল। সে রাত সেখানে থেকে পরদিন সকালে গোরেলা যাবে তারা গোরেলার হাটে বেচাকেনা করবে বলে। কয়েকটি মধুসিক্ত মৌচাক—এই তাদের বেসাতি। মৌচাক বেচে মাটির হাঁড়িকুড়ি কিনবে তারা। মেয়েটির ইচ্ছে কিছু কাঁচের চুড়ি কেনার।

অমরকণ্টক থেকে প্রায় ছ মাইল দূরের একটি গণ্ডগ্রাম থেকে আসছে তারা। মাসে একবার কী দুবার হাটের দিনে গোরেলার হাটে আসে তারা। নচেৎ তাদের গ্রামের মধ্যেই তাদের অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ। যুবকটি হিন্দী বোঝে না। মেয়েটি বোঝে। তার পিত্রালয় পেন্‌ড্রার কাছাকাছি ছত্রিশগড়ীদের গ্রামে। মেয়েটিকে প্রশ্ন করে আমরা জেনেছিলাম যে, তাদের গ্রামে কুমোর নেই। কাজেই হাট থেকে মাটির হাঁড়িকুড়ি কিনে আনতে হয়।

আমরা যখন চায়ের জল উনুনে চাপিয়েছিলাম, যুবকটি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তা নিরীক্ষণ করছিল মেয়েটির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে। আমরা ভাবলাম বুঝি জল গরম করার মধ্যে বিস্ময়কর কিছুর সন্ধান পেয়েছে সে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী দেখছ! খাবে নাকি একটু চা?

মেয়েটি এগিয়ে এসে বললে, ঐ ডেকচিটাকে দেখছে। ওরকম ডেকচি কখনো দেখেনি কি না।

সবিস্ময়ে বললাম, সে কী! অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি তো ঘরে ঘরে রয়েছে।

মেয়েটি বললে, ওদের ঘরে নেই। ওদের ঘরে শুধু মেটে হাঁড়িকুড়ি। আমার বাপের বাড়িতে এ সব এন্তার আছে। এ রকম বাসনে আমার মা ভাত রান্না করে। পেতলের থালা ছাড়া আমাদের খাওয়াই হয় না। কিন্তু এরা হল জংলী ভূত। মেটে হাঁড়িতে ওদের রান্না চাপে, শালপাতায় ওরা খায়।

আমাদের কথাবার্তার এক বর্ণও বোধহয় যুবকটির কর্ণগোচর হয়নি। একদৃষ্টে সে অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিটির দিকে তাকিয়ে থাকে—আপাতত যেন তার কাছে ঐ ডেকচিটি ছাড়া মনোনিবেশ যোগ্য বস্তু কিছুই নেই বিশ্ব-সংসারে।

মেয়েটি হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, হাঁ করে দেখছ কী! ও কী খাবার জিনিস!

যুবকটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে তার স্ত্রীর দিকে তাকায় বোকা বোকা চোখ করে তারপর আবার আড়চোখে দৃষ্টিপাত করে ডেকচিটির দিকে।

ততক্ষণে ডেকচির গরম জল চীনামাটির চায়ের পাত্রে ঢালা হয়েছে। শূন্য ডেকচিটি যুবকটির দিকে এগিয়ে দিয়ে আমি বললাম, এটা নেবে তো নাও না।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করে যুবকটি হাত বাড়িয়ে নিল ডেকচিটাকে। তার সরল মুখে অকৃত্রিম খুশির আভা ফুটে ওঠে।

কিন্তু মেয়েটি ছোঁ মেরে ডেকচিটি তার স্বামীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমাকে প্রত্যর্পণ করে বললে, নিচ্ছ যে বড়, হ্যাংলা কোথাকার! মেটে হাঁড়িকুড়িতে অভ্যেস, অ্যালুমিনিয়ামের নবাবী সইবে কী!

যুবকটি আর্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। কিছু অবশ্য বলে না। তার মৌন বেদনায় ব্যথিত বোধ করে মেয়েটির উদ্দেশ্যে আমি বললাম, আহা নিক না। আমি যখন ওকে দিয়েই দিচ্ছি, ওর নিতে দোষ কী!

মেয়েটি আবেগকম্পিত স্বরে বললে, অনেক দোষ আছে। বিয়ের পর বাপ-মায়ের দেওয়া দুটো পেতলের থালা নিয়ে এসেছিলুম আমি, ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি ওর মা কুয়োর ভেতরে! বলেনি যে পেতলের থালায় খাওয়ার শহুরে-

পনা চলবে না! আমার পেতলের থালা যখন রাখতে দেয়নি ওরা, আমি কেন ওকে নিতে দেব এটা! কক্ষণো না।

বলে যুবকটির হাত ধরে একরকম টানতে টানতে নিজেদের আস্তানার দিকে অগ্রসর হয় সে।

চা পান করতে করতে চার পাশে ব্যাসল্টের ওপরে ল্যাটেরাইট ও বক্সাইটের আবরণের মধ্যে কল্পনা করি অ্যালুমিনিয়ামের রূপালী জৌলুস। নতুন যুগকে বহন করছে এই নতুন ধাতু। অচিরে অমরকণ্টকে বক্সাইটের খনি পত্তন হবে। অমরকণ্টক থেকে কিছু দূরে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনেরও আয়োজন হবে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা তাকে স্বীকৃতি দেবে কি না সন্দেহ। হাজার হাজার বছর আগেকার মাটির পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে তারা, নতুন যুগের নতুন ধাতু কী সহজে উত্তীর্ণ হতে পারবে তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে!

॥ ১৬ ॥

প্রসাধন থেকে প্রতিরক্ষা

এ্যালুমিনিয়াম নতুন ধাতু। এবারে খুব পুরোনো একটি ধাতুর কথা বলব। এমন একটি ধাতু যা সোনার মতই মানুষের সভ্যতার প্রথম প্রহরকে চিহ্নিত করেছে।

আদিতে ব্যবহার হ'ত শুধু চোখে বাহার আনার জন্য—ছিল প্রসাধনের সামগ্রী মাত্র, আজকাল তার মধ্য থেকে আহরিত হচ্ছে সংহারের শক্তি। যা চোখে বাহার আনত, তা' শত্রু সংহার করছে—প্রসাধন থেকে তা' প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হ'য়েছে। বস্তুটি একটি ধাতু। তামা-লোহার মত প্রয়োজনীয়, বা সোনা-রূপার মত দামী নয়—দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে স্থান পায়নি। কিন্তু প্রতিরক্ষার তাগিদে তা' আজ অতি প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছে।

ধাতুটির নাম 'অ্যান্টিমনি'—ল্যাটিন ভাষায় 'স্টিবিয়াম' (Stibium) নামে পরিচিত। অ্যান্টিমনি খুবই পুরাতন ধাতু। সোনার সঙ্গেই তা' মানুষের ব্যবহারে এসেছে। মানুষের সভ্যতার প্রথম প্রহর যেমন স্বর্ণমণ্ডিত, তেমনি অ্যান্টিমনির কালিমাতেও রঞ্জিত। অ্যান্টিমনিযুক্ত খনিজ 'ষ্টিবনাইট' (Stibnite)

থেকে সুর্মা তৈরি করতে সভ্যতার গোড়াতেই শিখেছিল মানুষ। প্রসাধনের আদি পর্বেই তার স্থান। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের নায়িকারা চোখের স্বাভাবিক প্রসারকে আয়ততর করতেন চোখে সুর্মার রেখা টেনে। মিশর, চ্যালডিয়া ও ব্যাবিলনের সুন্দরীদের সুর্মা আঁকা চোখ ইতিহাসের পাতা থেকে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

চোখের প্রসাধনে ব্যবহৃত হ'ত অ্যাণ্টিমনিযুক্ত খনিজ 'ষ্টিবনাইট'। সুর্মা তৈরি করা হ'ত ষ্টিবনাইট দিয়ে। ষ্টিবনাইট থেকে অ্যাণ্টিমনি ধাতু নিষ্কাশনের কৌশল সুদূর প্রাচীনকালেই মানুষের আয়ত্তে এসেছিল। চ্যালডিয়ানরা অ্যাণ্টি-মনি ধাতু দিয়ে যেসব পাত্র নির্মাণ করতেন, তাদের নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন।

মধ্যযুগে অ্যাণ্টিমনিযুক্ত কয়েকটি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ ঔষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হ'তে থাকে। কিন্তু তাদের প্রয়োগ প্রায়ই এমনি মারাত্মক হ'য়ে উঠত যে আইন ক'রে তাদের ব্যবহার বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে অ্যাণ্টিমনির সঙ্গে কয়েকটি ধাতু মিশিয়ে আয়না ও ঘণ্টা তৈরি করা হ'ত। অ্যাণ্টিমনিযুক্ত আয়না ও ঘণ্টা দুইই ছিল পরম মূল্যবান সামগ্রী—সর্বসাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের নামিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। কাজেই কালক্রমে সর্বজনীন দাবীতে আয়না থেকে অ্যাণ্টিমনির বিলাস হ'ল বিলুপ্ত—সুলভ অক্সিজেনযুক্ত পারদের প্রলেপ দিয়ে আয়না তৈরি করা হ'ল। সর্বজনীন চাহিদায় ঘণ্টা থেকেও বিদায় নিল অ্যাণ্টিমনি।

কালক্রমে রকমারি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অ্যাণ্টিমনির প্রয়োগ হ'তে থাকে। স্বকীয় বিশুদ্ধ ধাতব রূপে বা অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্রণে ব্যাটারি, ছাপার অক্ষর, জাহাজের পেরেক প্রভৃতি নানারকম বস্তু নির্মাণে অ্যাণ্টিমনি ব্যবহৃত হ'তে শুরু করে। সীসার কমনীয়তা হ্রাস করতে অ্যাণ্টিমনির সংযোগ আবশ্যক হ'য়ে ওঠে। অ্যাণ্টিমনি দিয়ে রঙও তৈরি করা হয়। লাল, হলুদ ও সাদা— এক অ্যাণ্টিমনি এই ত্রিবর্ণের উৎস।

আধুনিক কালে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে প্রসারিত হ'য়ে অ্যাণ্টিমনি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছে। অ্যাণ্টিমনি ও গন্ধকের সংযোগে প্রস্তুত 'অ্যাণ্টিমনি ট্রাই-সাল্‌ফাইড' বিস্ফোরক না হ'লেও বিস্ফোরণের সহায়ক। কার্তুজের মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থের পাশেই তার স্থান। আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার টিপলে তা'

বিস্ফোরক পদার্থের মধ্যে বিস্ফোরণের সূচনা করে। অ্যান্টিমনি ট্রাই-সাল্‌ফাইড দিয়ে সাদা ধোঁয়ার আবরণও সৃষ্টি করা চলে। যুদ্ধক্ষেত্রে ধূম্রজাল বিস্তারের জন্য অ্যান্টিমনি ট্রাই-সাল্‌ফাইড দিয়ে শ্রাপনেল শেল নামে এক ধরনের গোলা তৈরি করা হয়। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আন্টিমনিকে সমরোপকরণের শ্রেণীভুক্ত ধাতুদের পংক্তিতে আনা হ'য়েছে।

অ্যান্টিমনির প্রধান উৎস হ'ল 'স্টিবনাইট' (Stibnite) নামক খনিজ। স্টিবনাইট হ'ল গন্ধকযুক্ত অ্যান্টিমনি। অ্যান্টিমনি ও অক্সিজেনের সমাহার 'ভ্যালেন্টিনাইট' নামে অ্যান্টিমনিযুক্ত আর একটি খনিজ আছে—কিন্তু প্রকৃতির বুকে তা' স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। অ্যান্টিমনি কদাচিৎ কোথাও কোথাও বিশুদ্ধ ধাতুরূপেও অবস্থান করে।

অ্যান্টিমনিযুক্ত খনিজে সমৃদ্ধতম হ'ল মেক্সিকো, বলিভিয়া ও চীন—স্বল্প সমৃদ্ধির দাবী করতে পারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ।

ভারতে এ পর্যন্ত অ্যান্টিমনিযুক্ত খনিজের কোনও উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়নি। পাঞ্জাবের লাহাউল-স্পিটি জেলায় হিমালয়ের দুর্গমতার মধ্যে 'বড় শিগরি' নামক হিমবাহের কাছে সীসা, দস্তা, তামা প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে সহ-অবস্থিত অ্যান্টিমনির সন্ধান পেয়েছেন ভূতাত্ত্বিকরা। কিন্তু হিমবাহ ডিঙ্গিয়ে তার নাগাল পাওয়া সহজ নয়।

পাঞ্জাবের লাহাউল-স্পিটি জেলা ছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশের কাদাপ্পা, বিহারের হাজারিবাগ এবং মহীশূরের বেলারি ও চিতলদ্রুগ জেলাতেও অ্যান্টিমনিযুক্ত খনিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত আছেন ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকরা।

প্রতিরক্ষার চাহিদার দরুন অ্যান্টমনির উৎসের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারতের যে যে অঞ্চলে স্টিবনাইটের অস্তিত্বের আভাস মিলেছে, সে সব জায়গায় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করা দরকার। ভূপৃষ্ঠে যেটুকু আত্ম-প্রকাশ করেছে, এ পর্যন্ত ভূতাত্ত্বিকদের পর্যবেক্ষণ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তাঁদের চোখের দেখাকে বৈজ্ঞানিক পরিক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ভূগর্ভে প্রসারিত করতে হ'বে। এমনি গভীর তত্ত্বতালাসের ফলে হয়তো কোথাও না কোথাও অ্যান্টিমনিযুক্ত খনিজের উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হ'বে ভূগর্ভের প্রচ্ছন্নতা থেকে।

॥ ১৭ ॥

পারমাণবিক শক্তির উৎস সন্ধানে

এ্যান্টিমনি, এ্যালুমিনিয়াম, লোহা, তামা প্রভৃতি সব ধাতু এবং সব বস্তুর সূক্ষ্মতম অবস্থা হল পরমাণু।

তার চেয়েও সূক্ষ্মে উপনীত হ'তে চাইলে বস্তুর সীমাকে অতিক্রম ক'রে যেতে হয়। পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করলে বস্তুর বাঁধন যায় ঘুচে। মুক্তি পায় দুর্বার শক্তি। পারমাণবিক বিস্ফোরণের মধ্যে এই শক্তির প্রকাশ।

বস্তুর মধ্যে এই শক্তি সংহত। এই সংহতিই বস্তুর বাস্তব সত্তার ভারসাম্য বজায় রেখেছে। পৃথিবীর মৌল উপাদানগুলি বস্তুসীমায় বাঁধা। কিন্তু এই বাঁধন শিথিল সুদূর নক্ষত্রলোকে। সেখানে বস্তু অতিক্রম করে তার সীমা। পৃথিবীতে জড়প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি সংহত, সেখানে তার অবাধ মুক্তি। নক্ষত্রের আলোকসভায় তার লীলা। মহাকাশের শূন্যতার মধ্যে পরিস্রুত হ'য়ে এই শক্তির ছিঁটেফোঁটা এই পৃথিবীতে এসে পৌছয়। পৃথিবীর ওপরে তার অদৃশ্য পদক্ষেপ ধরা পড়েছে তেজস্ক্রিয়তা-মাপনী যন্ত্রে। বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন মহাজাগতিক রশ্মি।

মহাজাগতিক রশ্মি আভাস দিল বস্তুর পরমাণুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন শক্তির। বিজ্ঞানীরা এই শক্তিকে আয়ত্ত করার জন্য গবেষণা শুরু করলেন। বস্তুর অন্তর্নিহিত মহাশক্তির স্বরূপ আবিষ্কার করলেন আইনষ্টাইন। বস্তুর আবরণকে বিদীর্ণ ক'রে আহরিত শক্তির পরিমাণকে বাঁধলেন তিনি একটি গাণিতিক সূত্রের মধ্যে। বস্তুকে সমন্বয় করলেন শক্তির সঙ্গে।

সূত্র পাওয়া গেল। এরপর সূত্র অনুসরণ ক'রে পরমাণু বিদীর্ণ করার কৌশল উদ্ভাবনের জন্য উঠে প'ড়ে লাগলেন পদার্থবিদ্‌রা।

বস্তু জড়ত্বের পাষাণ কারাগার। তার মর্মমূলে আঘাত হেনে তার বাস্তব সত্তাকে বিশ্লিষ্ট করা কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে, সব বস্তুই অচলায়তনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। বস্তুজগতের রক্ষণশীলতার ব্যতিক্রম দেখা যায় তেজস্ক্রিয় ধাতুগুলির মধ্যে। তাঁরা দেখলেন যে, তেজ বিকীর্ণ

করে তাদের বস্তুসত্তা সততই পরিবর্তিত হচ্ছে। এই রূপান্তরের মধ্যে আছে বাস্তব সত্তা অতিক্রমের প্রবণতা। সাইক্লোট্রোণ নামে একটি যন্ত্রে তেজস্ক্রিয় য়ুরেনিয়ামের পরমাণু বিদারণে সমর্থ হ'লেন আমেরিকার বিজ্ঞানী ফার্মি। আইনষ্টাইনের সূত্র পেল পরীক্ষামূলক স্বীকৃতি। যে মহাশক্তির কল্পনা এতদিন বৈজ্ঞানিক সূত্রের মধ্যে নিহিত ছিল, মুক্তি পেল তা' সাইক্লোট্রোণের আধারে।

পারমাণবিক শক্তির মূলে উৎস হ'ল দুটি তেজস্ক্রিয় ধাতু—য়ুরেনিয়াম ও থোরিয়াম। হাইড্রোজেনের পরমাণু বিদারণের সাম্প্রতিক সাফল্য পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে যে কোনও অতেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহারের সম্ভাবনাকে সূচিত করেছে। ভবিষ্যতে হয়তো সব বস্তু থেকেই পারমাণবিক শক্তি আহরণ করা সম্ভব হবে। যতদিন তা' না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত অবশ্য পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে য়ুরেনিয়াম ও থোরিয়ামের বিশেষ স্বীকৃতি থাকবে।

য়ুরেনিয়াম ও থোরিয়াম কয়েকটি দুর্লভ খনিজের মধ্যে পাওয়া যায়। য়ুরেনিয়ামযুক্ত খনিজগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল পিচ্‌ব্লেণ্ড্। পিচের মত কালো রঙ, তাই এই নাম। পাথরের স্তরে ফাটল ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসা শিলার শিরায় ছোট ছোট পিণ্ডের মত ছড়ানো থাকে পিচ্‌ব্লেণ্ড্। জলের সংযোগে পিচ্‌ব্লেণ্ড্ হলুদ ও সিঁদুরে রঙের অকারে (Ochre) রূপান্তরিত হয়। তামার সঙ্গে যুক্ত য়ুরেনিয়ামের খনিজ টর্বার্নাইট (Torbernite) পাওয়া যায় অনেক তাম্রক্ষেত্রে। য়ুরেনিয়ামের সঙ্গে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের সংযোগ সৃষ্টি করে অটানাইট (Autunite)নামে খনিজের—পটাশিয়াম ও ভ্যানেডিয়ামের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে কার্নোটাইটের (Carnotite) উৎপত্তি হয়। টর্বার্নাইটের বিশেষত্ব হ'ল তার উজ্জ্বল সবুজ রঙ। অটানাইট ও কার্নোটাইটে রঙ হলুদ। য়ুরেনিয়ামযুক্ত আরও কয়েকটি খনিজ আছে।

থোরিয়াম ধাতুর প্রধান উৎস হ'ল মোনাজাইট (Monazite) নামে একটি মধুরঙের খনিজ। পেগ্‌মেটাইট (Pegmatite) নামে শিলার শিরাতে মোনাজাইট পাওয়া যায়—কিন্তু স্বল্প পরিমাণে। পাথরের বাঁধন থেকে আলগা হ'য়ে নদী ও সমুদ্রের তীরের বালিতে মিশে মোনাজাইটের উল্লেখযোগ্য সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

য়ুরেনিয়ামযুক্ত খনিজে সমৃদ্ধতম হ'ল কঙ্গো ও কানাডা। য়ুরেনিয়ামে সমৃদ্ধির দাবি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, চেকোস্লোভেকিয়া, জার্মানি, পর্তুগাল,

অষ্ট্রেলিয়া, ম্যাডাগাস্কার প্রভৃতি দেশও করে। এই খনিজে স্বল্প সমৃদ্ধি অবশ্য অনেক দেশেরই আছে। ভারতের সিংহভূম ও আরাবল্লীর তাম্রক্ষেত্রে য়ুরোনিয়ামের অস্তিত্ব সাম্প্রতিক সমীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে।

থোরিয়ামযুক্ত মোনাজাইটের সমৃদ্ধি রয়েছে ভারত, সিংহল, মালয়, ইন্দো-নেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূল জুড়ে সাগরধোয়া বালির বিস্তারে অন্তরঙ্গভাবে মিশে আছে মোনাজাইটের কণা। বালির মধ্যে বিলীন হ'লেও জায়গায় জোট বেঁধেছে মোনাজাইট—বিশেষ ক'রে কেরালার সমুদ্র-উপকূলে।

১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়। মাত্র দুটি বোমা—কিন্তু অসাধারণ তাদের বিনাশশক্তি। দুটি বোমার বিস্ফোরণ বড় বড় দুটি শহরকে করল ধ্বংস। পরমাণু থেকে মুক্তি পাওয়া মহাশক্তি পূর্ব রণাঙ্গনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটাল।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের পর থেকে সারাবিশ্বে তেজস্ক্রিয় খনিজ খোঁজের হিড়িক পড়ে গেল। 'গোল্ড রাশের' মত শুরু হ'ল য়ুরেনিয়াম রাশ্। বিশেষ ক'রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়। তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্র Geiger Muller Counter নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সন্ধানীর দল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নানাশ্রেণীর লোক। ভূতত্ত্ব যাঁদের পেশা নয়, য়ুরেনিয়াম খোঁজার নেশা তাঁদেরও পেয়ে বসল। বহু দুর্গম পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করলেন তাঁরা, সন্ধানের ঝোঁকে বিচরণ করলেন নিস্তৃণ মরু-প্রান্তর।

ভের্নন পিক্ ছিলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন শৌখীন ভূতাত্ত্বিক। ভূতত্ত্ব তাঁর পেশা ছিল না কখনো। য়ুরেনিয়াম সন্ধানের হিড়িকের মধ্যে তিনিও একটি তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি রুটার মরু অঞ্চলে দুর্গম গিরিকন্দরে বিরাট একটি য়ুরেনিয়ামের খনি আবিষ্কার করে ছিলেন। এই খনির মূল্য ছ'কোটি টাকা।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক প্রত্নতাত্ত্বিক দক্ষিণ ডাকোটাতে পাহাড়ী নদীর খাতের মধ্যে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের প্রাচীন চিত্রকলার নিদর্শন খুঁজছিলেন। পাথরে আঁকা চিত্রকলার পাশাপাশি হঠাৎ তিনি একদিন উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটি খনিজ আবিষ্কার করলেন। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল খনিজটি য়ুরেনিয়ামের আকর

'কার্নোটাইট'। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ক'রে এখানে বিপুল একটি য়ুরেনিয়ামের গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেল। গ'ড়ে উঠল একটি য়ুরেনিয়ামের খনি ও খনির পাশাপাশি পারমাণবিক শক্তিতে চালিত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারখানা।

সন্ধানীদের তৎপরতায় কানাডায় ব্লেয়ার ও জিমেল অঞ্চলের গিরিকন্দরে উহ্য য়ুরেনিয়ামের বিপুল ভাণ্ডারগুলির সন্ধান পাওয়া গেল।

১৯৫০ সাল থেকে ভারতীয় পারমানবিক শক্তি সংস্থা য়ুরেনিয়ামের খনিজের খোঁজ আরম্ভ করলেন। প্রথম সন্ধান শুরু হ'ল রাজপুতানায় ও বিহারে।

রাজপুতানায় আরাবল্লী পর্বতের পাষাণপঞ্জরে নানারকম খনিজ আছে। তামা আছে, সীসা, দস্তা ও রূপা আছে, আছে অভ্র ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ খনিজ। এইসব খনিজের সঙ্গে য়ুরেনিয়ামযুক্ত খনিজের অস্তিত্বের সম্ভবনার কথা বিবেচনা ক'রে অনুসন্ধান পর্ব চলে আরাবল্লী অঞ্চলে।

বিহারের অভ্র ও তামার খনি অঞ্চলেও য়ুরেনিয়ামের অস্তিত্ব সম্ভব। যেখানে যেখানে তামা ও অভ্র আছে, সে সব জায়গাতে শুরু হয় য়ুরেনিয়ামযুক্ত খনিজের সন্ধান।

সিংভূম জেলায় ঘাটশিলার পশ্চিমদিকে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত একটানা পাহাড় দেখা যায়। ঘন বনের আচ্ছাদনে পাহাড়টিকে ধোঁয়াটে সবুজ দেখায় ঘাটশিলা থেকে। এই পাহাড়ে তামা আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোসাবনিতে তামার খনি আছে। মোসাবনির দক্ষিণে বহেরা-গোড়ায় তামার পাহাড়ের সূচনা। উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় আশি মাইল পর্যন্ত তার বিস্তার।

এই বিস্তীর্ণ তাম্র অঞ্চলে য়ুরেনিয়ামের খোঁজ করেন ভূবিদ্‌রা। পাথরের স্তরে স্তরে উহ্য য়ুরেনিয়ামের সন্ধানে তৎপর হন তাঁরা তেজস্ক্রিয়তা মাপনী যন্ত্রের সাহায্যে। নিস্তেজ জড়তার মধ্যে কোথাও সামান্যতম তেজ বিকীর্ণ হ'লেই যন্ত্রটিতে তা' ধরা পড়ে। সাধারণ কোয়ার্ট্‌জাইট্‌ বা ফিলাইট্‌ পাথরের স্তরগুলির মধ্যে যন্ত্রটি নির্জীব হ'য়ে থাকে। কিন্তু তেজস্ক্রিয় য়ুরেনিয়ামের ছিঁটেফোঁটাও পাথরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকলে যন্ত্রটিতে প্রাণ সঞ্চার হয়। য়ুরেনিয়াম থেকে বিকীর্ণ অদৃশ্য তেজ যন্ত্রটির কাঁটাকে স্পন্দিত ক'রে তোলে।

সমীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে, তামার পাহাড়ে তামার খনিজের সঙ্গে

সহাবস্থান করছে তামাযুক্ত য়ুরেনিয়ামের খনিজ টর্বার্নাইট এবং ফসফেট ও য়ুরেনিয়ামের যোগফল অটানাইট্।

পারমাণবিক শক্তি সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণী থেকে জানা গেছে যে, সিংভূম ও আরাবল্লী এই দুই অঞ্চল মিলিয়ে এ পর্যন্ত মোট যত য়ুরেনিয়ামযুক্ত খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ টন য়ুরেনিয়াম আছে। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীর ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নদীনীর বাহিত বালিকণার মধ্যে মিশে থাকা থোরিয়ামযুক্ত মোনাজাইটের মোট পরিমাণ প্রায় বিশ লক্ষ টন। বিশ লক্ষ টন মোনাজাইটের মধ্যে আছে প্রায় দুই লক্ষ টন থোরিয়াম।

সমীক্ষা এখনো চলছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও য়ুরেনিয়াম ও থোরি-য়ামের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে।

এ পর্যন্ত যা' বোঝা গেছে তাতে স্পষ্ট ক'রে বলা চলে যে, পারমাণবিক শক্তিতে ভারত দীন নয়। এ পর্যন্ত যত য়ুরেনিয়াম ও থোরিয়ামের অস্তিত্ব এ দেশে প্রমাণিত হয়েছে, তার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রায় ষাট হাজার কোটি টন কয়লার সমতুল্য।

যে মহাশক্তিকে ভারত আয়ত্ত করেছে তার উপযুক্ত প্রয়োগের প্রয়াস চলছে। বোম্বাইয়ের ট্রম্বে ও গুজরাটের তারাপুরে পরমাণু বিদীর্ণ ক'রে শক্তি আহরণের জন্য সাইক্লোট্রোণ যন্ত্র বসানো হয়েছে। তারাপুরে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের আয়োজন হচ্ছে। রাজস্থানের মেবারে রাণা প্রতাপ সাগর হ্রদের তীরেও পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

দেশের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও নানা ক্ষেত্রে এই মহাশক্তির প্রয়োগের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন এ দেশের বিজ্ঞানীরা।

সম্প্রতি রাজস্থানের মরুক্ষেত্রে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারত পারমাণবিক শক্তিকে পুরোপুরি আয়ত্ত করেছে। এখন এই মহাশক্তির সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের জন্য গবেষণা চলছে।

॥ ১৮ ॥

বেরিলিয়াম

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে আর একটি ধাতু অপরিহার্য, তা হচ্ছে বেরিলিয়াম। পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টির পূর্বে অবশ্য বিমান নির্মাণে তার ব্যবহার ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতে প্রাচীন ভারতীয় বৈমানিকদের পুষ্পক রথে চড়ে আকাশপথ জয় করার অনেক চমকপ্রদ কাহিনী পড়েছি আমরা। কাহিনীগুলি ঐতিহাসিকদের মতে কল্পনামাত্র।

সেই কল্পনাকে যেন আজ মূর্ত হতে দেখছি ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিস্ময়কর তৎপরতার মধ্যে। শূন্যপথে এ দেশের বৈমানিকদের অপরূপ দুঃসাহস যেন রামায়ণ-মহাভারতের পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ভারতীয় বিমানরথীদের তৎপরতা আমাদের মনে বিমান সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার করে। গতির সঙ্গে শক্তির সমাহার হল বিমান। আকাশ পথে হাল্কা চালে দ্রুত তালে চলে তা শব্দের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এই সহজ স্বচ্ছন্দ বিদ্যুৎ-বেগের জন্য বিমানের যথাসম্ভব ভারবিহীন হওয়া দরকার। বিমানপোত নির্মাণে তাই হাল্কা অথচ মজবুত জাতের ধাতুর ব্যবহার অপরিহার্য।

যে সব ধাতুকে হাল্কার শ্রেণীতে ফেলা যায় তাদের মধ্যে বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে বেরিলয়াম (Beryllium)। হাল্কা হ'লেও তা প্রায় পাথরের মত মজবুত। সেই সঙ্গে রয়েছে তার অসাধারণ তাপ সইবার ক্ষমতা। তাপ-মাত্রা ১২৮৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উঠলে তবে তা গলে। এই সব দ্রব্যগুণের সমন্বয়ের দরুন বিমান নির্মাণে বেরিলিয়ামের যোগ্যতা বিশেষভাবে স্বীকৃত।

বিমান নির্মাণ ছাড়া পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বেরিলিয়াম বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। সাইক্লোট্রোনের মধ্যে বেরিলিয়ামের বেষ্টনী থাকে। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য পরমাণু-বিদারণ বেরিলিয়ামের ওপরে করা হয়। পারমাণবিক তেজপুঞ্জ ধারণের অসাধারণ ক্ষমতা বেরিলিয়ামের আছে।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে শতাধিক বৎসরেরও ওপর প্রায় অপ্রয়োজনীয়ের পংক্তিভুক্ত হয়েছিল বেরিলিয়াম। ধাতুজগতে এই উপক্ষিতের সীমাবদ্ধ ব্যবহার ছিল এক্স-রে, নিওন আলোর টিউব ও গুটিকয়েক ধাতুর সঙ্গে মিশ্রণে তৈরি সঙ্কর ধাতুর উৎপাদনে। বিমান নির্মাণ ও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জরুরী তলব পড়ার ফলে তা সাধারণদের স্তর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিশিষ্টদের মধ্যে কৌলীন্যের মর্যাদা পেল।

বেরিলিয়ামের উৎস হল **Beryl** নামে একটি খনিজ। সবুজ থেকে সমুদ্রনীল, স্বচ্ছ থেকে শাদা, কদাচিৎ ফিকে লালচে রঙের এই খনিজটির বিশেষত্ব হল তার ষড়ভুজ আকার—লম্বাটে গড়ন। পেগমেটাইট (Pegmatite) নামে শিলার মধ্যে এর অবস্থান। গ্র্যানাইট (Granite) বা মাইকা-সিস্ট (Mica-schist) নামে পাথরকে শিরার মত বিদীর্ণ করে অবস্থান করে পেগমেটাইট। পেগমেটাইট পাথরে অভ্র, কোয়ার্টজ, ফেলস্পার প্রভৃতি খনিজের সঙ্গে সহাবস্থান করে বেরিল; সাধারণত স্বল্প পরিমাণে। পেগমেটাইটের মধ্যে কোয়ার্টজ ও ফেলস্পারের আবরণে প্রচ্ছন্ন থেকে তা ছোট বড় নানা আকারে বিরাজ করে। ক্ষেত্রবিশেষে তা বিপুল আকার নেয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোনও একটি খনিতে প্রায় সাতাশ ফুট লম্বা একটি বেরিল পাওয়া গিয়েছিল—ছ'ফুট তার ব্যাস এবং ওজনে তা প্রায় পনর টন।

অভ্র নামক খনিজে ভারত পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম। অভ্রযুক্ত পেগমেটাইট শিলা বেরিলেরও উৎস। অভ্রের সমৃদ্ধি বেরিলের সমৃদ্ধিরও আভাস দেয়। কিন্তু যতদিন বেরিল তেমন প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠেনি, ততদিন বেরিল ভূতাত্ত্বিকদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। বেরিলের জন্য যথোপযুক্ত ভূতাত্ত্বিক তত্ত্বতালাস না হওয়াতে, ভারতীয় পেগমেটাইট শিলাগুলির মধ্যে অভ্রের অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা বেরিলের ভাণ্ডার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। দরকারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে পাশমার্কা পাওয়া খনিজ বস্তুগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত এ দেশের ভূতাত্ত্বিকদের সন্ধানী দৃষ্টি। বিশ্বব্যাপী চাহিদার নিরিখে দরকারীদের মধ্যে অভ্রের স্থান হয়ে উঠেছিল প্রায় অভ্রভেদী, কাজেই অভ্রের জন্য পেগমেটাইটের শিলাগুলিতে ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল। অথচ অভ্রের সঙ্গে সহ-

অবস্থিত হয়েও বেরিল উপেক্ষিত থেকেছিল প্রয়োজনীয়দের পংক্তিতে তা স্থান পায়নি বলে। ভারত ছাড়া যে সব দেশে অভ্রের উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার রয়েছে, যেমন সোভিয়েট রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা, সে সব দেশ অবশ্য বেরিলকে কখনো উপেক্ষা করেনি, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার জন্য বিশেষ দাবি না থাকা সত্ত্বেও। বেরিলের জন্য রীতিমত ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালিয়ে বেরিলের সমৃদ্ধি ঘোষণা করেছিল তারা, যদিও বেরিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভ্রের ভাণ্ডার তাদের ভারতের মত সমৃদ্ধ ছিল না। অভ্রের মত বেরিলেও যে ভারত সমৃদ্ধ হতে পারে, তা' প্রমাণসাপেক্ষ হয়ে রইল দীর্ঘকাল।

ভারতে বেরিলের জন্য ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার দাবি এল ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থার তরফ থেকে। এই সংস্থার খনিজ-সমীক্ষা বিভাগ থেকে যখন পারমাণবিক শক্তির উৎস সন্ধানের কাজ শুরু করা হল, তখন বেরিলের সন্ধানের জন্যও কার্যসূচি রচনা করা হল।

বিগত প্রায় পনর বছর ধরে চলেছে বেরিলের জন্য ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা। সন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, ভারতের অভ্র-খনি-অঞ্চলগুলিতে অসংখ্য পেগমেটাইটের শিরা বেরিলে সম্পৃক্ত। বিহার, রাজস্থান ও অন্ধ্র—এই তিনটি প্রদেশে অভ্রের খনি আছে। অভ্রের খনিগুলি আজকাল বেরিলেরও খনি হয়ে উঠেছে। কোনও কোনও পেগমেটাইটের শিরা অভ্রে দীন হলেও বেরিলে সমৃদ্ধ। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র বেরিলের জন্য খনি পত্তনের উদ্যোগ চলছে।

পেগমেটাইটের মধ্যে অভ্রের অস্তিত্ব প্রকাশ্য। বাইরে থেকে দেখেই তাকে অভ্রযুক্ত বলে চেনা যেতে পারে। কিন্তু বেরিল থাকে পেগমেটাইটের কোয়ার্টজ ও ফেলস্পারের আবরণের আড়ালে প্রচ্ছন্ন হয়ে। বাইরের থেকে পরীক্ষা করে পেগমেটাইটের ভেতরকার খবর মেলে না। খোঁড়াখুঁড়ি করে বাইরের আবরণ ভেদ করে বেরিলের গুপ্ত ভাণ্ডারে উপনীত হওয়া যায়।

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকরা বলেন যে, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ও বিমান-পোত নির্মাণের জন্য বেরিলিয়ামের চাহিদা যত বাড়ুক না কেন, ভারতের অভ্র-খনি-অঞ্চলগুলি থেকে বেরিল সব সময়ই পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় পরিমাণে। এই অতি মূল্যবান খনিজটিতে ভারত যে স্বয়ংসম্পূর্ণ সে বিষয়ে তাঁরা সুনিশ্চিত হয়েছেন।

॥ ১৯ ॥

থির বিজুরি

হাজারিবাগের সঙ্গে মুঙ্গের জেলাতেও ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালিয়েছি আমি। প্রধানতঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি পেগমেটাইট (pegmatite) নামক শিলাতে পারমাণবিক শক্তির উৎসের সন্ধানে। এই অনুসন্ধানের বৃত্তান্ত আগেই লিপিবদ্ধ করেছি। পারমাণবিক শক্তির উৎস খুঁজতে গিয়ে অভ্রের দিকেও নজর দিতে হয়েছে, কারণ পেগমেটাইট পরীক্ষা করতে গেলে অভ্রকে উপেক্ষা করার উপায় নেই।

মুঙ্গের জেলায় বাটিয়া নামে গ্রামে আলাপ হ'ল সঞ্জয় সামন্তর সঙ্গে। অভ্রের কারবার আছে তাঁর। কাছাকাছি একটি খনি থেকে কাঁচা অভ্র কিনে এনে কাটাছাঁটা করে চালান দেন তিনি গিরিডির কারবারীদের কাছে। একটি ছোট চালাঘরে তাঁর অভ্র ছাঁটাইয়ের কারখানা।

মাটিতে মাদুরের আসন বিছিয়ে একটি নিচু ডেস্কের সামনে বসেন সামন্তবাবু। ডেস্কের ওপরে খোলা থাকে লাল সালুতে বাঁধান খেরো খাতা। পাশে ওজন ও আয়তন নির্ণয় করার সরঞ্জাম। তাঁর সামনে দুই পাশে সারি দিয়ে বসে আছে মজুরের দল। খনি থেকে কেটে আনা অভ্রের স্তূপকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিশ্লিষ্ট করে অভ্রের পাত বের করে আনছে তারা। খনি থেকে খনন করে আনা নিষ্প্রভ পাথরের পিণ্ডে অস্ত্রাঘাত করে অভ্রের চুনী রঙের দ্যুতির উদ্বোধন করছে তারা। সাদা ও কালো রঙের পাথরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দীপ্তিকে সহজ নৈপুণ্যের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করে চলেছে।

অভ্রকে ইংরেজীতে বলে 'mica'। ল্যাটিন 'mico' শব্দ থেকে 'mica'র ব্যুৎপত্তি। mico মানে, প্রদীপ্ত। আরবী ভাষায় অভ্রকে বলে 'কাউকাবুল্-আজ্'—অর্থাৎ পৃথিবীর নক্ষত্র। সংস্কৃতে অভ্র মানে আকাশ। প্রাচীন ভারতীয়রা অভ্রের মধ্যে আকাশ-ভরা আলোর সভার প্রতিফলনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিব্বতী ভাষায় অভ্রকে বলে 'নাম-দো', অর্থাৎ আকাশ পাথর। পৃথিবীর দেশে

দেশে অভ্রের নামকরণের মধ্যে দিয়ে তার প্রোজ্জ্বল দীপ্তির ভাস্বরতা স্বীকৃত হয়েছে।

খনি শ্রমিকের খনিত্র অভ্রকে বিচ্ছিন্ন করে আনে বিশেষ এক ধরনের পাথরের জড়তার বাঁধন থেকে। এই পাথর হল 'পেগমেটাইট' (Pegmatite)। খুব শক্তগোছের পাথর। ফিকে লাল থেকে নিষ্কলুষ সাদা এর রঙ। অভ্রবাহী পেগমেটাইটের রঙ অবশ্য সাদা। সাদা পটে রূপালী চুমকির মত অভ্র বসানো থাকে—পাথরের কঠিন আধারে ধরা থাকে অসংখ্য স্বচ্ছ নমনীয় স্তরে সমষ্টিবদ্ধ হয়ে। পরতে পরতে সাজানো এক-একটি বাঁধানো বইয়ের মত লাগে দেখতে। পেগমেটাইট শিলা শিরার মত স্থানীয় শিলাস্তূপকে বিদীর্ণ করে।

পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে ভারতই অভ্রে সমৃদ্ধতম। বিহার, অন্ধ্র ও রাজপুতানায় পেগমেটাইটের শিরা-উপশিরাগুলি অভ্রসম্পৃক্ত। এত অভ্র আছে যে, সামান্য খোঁড়াখুঁড়ি করলেই পেগমেটাইটের সাদা আবরণ অপসৃত হয়ে অভ্রের জৌলুসকে করে উদ্‌ঘাটিত।

এ দেশে কয়েক শতাব্দী ধরে অভ্রের খনন হচ্ছে—কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় নি কখনো পাথরে প্রচ্ছন্ন অভ্রকে আয়ত্ত করতে। ওপরে ওপরে খনিত্র চালনা করেই প্রয়োজনীয় অভ্র আহরণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য অভ্রযুক্ত শিলার শিরাকে অনুসরণ করে ভূগর্ভের গভীরে খননের প্রয়োজন হয়। এলোমেলোভাবে খোঁড়াখুঁড়ি করা অবশ্য যে-কোনও খনিজের পক্ষে অপচয়মূলক। কাজেই খনি-বিজ্ঞানসমর্থিত পদ্ধতি প্রয়োগ করে অপচয় নিবারণের প্রচেষ্টা চলেছে আজকাল।

পৃথিবীতে প্রতি বছর মোট যত অভ্রের প্রয়োজন হয়, তার অধিকাংশ উৎপন্ন হয় ভারতে। ভারত ছাড়া সোভিয়েট রাশিয়া, আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, কানাডা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও অভ্রের উৎপাদন হয়—কিন্তু তার পরিমাণ নগণ্য।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে অভ্রের ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতে অভ্র ব্যবহার করা হ'ত নানারকম শক্তিশালী ওষুধ তৈরি করতে। গুণানুযায়ী অভ্রকে চার রকম শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন ভারতীয় ভেষজবিজ্ঞানীরা। তাদের নাম পিনাক, দাদুর, নাগ ও বজ্র। পিনাক আগুনের ছোঁয়া পেলেই শতধা বিদীর্ণ হয়। দাদুরকে আগুনে ফেললে ব্যাঙের মত কলরব করে ওঠে। নাগ আগুনের তাপে

সাপের মত হিসহিসিয়ে ওঠে। পিনাক, দাদুর ও নাগ বিষাক্ত—কাজেই ভেষজ হিসাবে ব্যবহার্য নয়। একমাত্র বজ্রকে আগুন ছুঁতে পারে না। বজ্র শ্রেণীর অভ্র অকালবার্ধক্য নিবারক ও জীবনীশক্তির উৎস। ভারতীয় ভেষজবিজ্ঞানীরা বজ্র থেকে ২২৪ রকমের ওষুধ তৈরি করেছিলেন।

অভ্রের ভেষজগুণ সম্পর্কে আয়ুর্বেদশাস্ত্রীদের অন্ধ আস্থা অনেক সময় ভেষজ-বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে ভেলকির পর্যায়ে গিয়ে পড়ত। ভারত ছাড়া প্রাচ্যের আরও কয়েটি দেশে অভ্রের ভেষজগুণ স্বীকৃত হয়েছিল।

ভেষজ ছাড়া গৃহের অলঙ্করণেও অভ্র ব্যবহার করতেন প্রাচীন ভারতীয়রা। আবাস-গৃহকে অভ্রের চুনীরঙের দীপ্তি দিয়ে মণ্ডিত করতে চাইতেন তাঁরা। শুধু গৃহের নয়, দেহের অলঙ্করণেও অভ্র ব্যবহার করা হত। সোনা-রূপা ও হীরা-মণি মুক্তার ঘটার পাশে অভ্রের জন্যেও জায়গা ছিল।

অলঙ্করণে অভ্রের সমাদর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছিল সুদূর প্রাচীনকাল থেকে। রোমের অ্যামফিথিয়েটারের মল্লভূমিকে বিশেষ দীপ্তিমণ্ডিত করে তোলার জন্য অভ্রের বড় বড় পাত ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করেছেন প্লিনি।

আধুনিককালে অভ্র প্রধানত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিদ্যুতের প্রবাহ বহনে অক্ষম বলে বিদ্যুতকে নিরাপদ আধারে ধরে রাখতে অভ্র অপরিহার্য। অভ্রের গৌণ ব্যবহার হয় বয়লার ও ধাতু নিষ্কাশনের চুল্লীর তাপরোধক আবরণ তৈরী করতে। অভ্রের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয় রঙ, কাগজ ও রবার। বাতি-চিমনি ও জানালার শার্সিতে মাঝে মাঝে অভ্র কাঁচের জায়গা নেয়।

সঞ্জয় সামন্তর অভ্র ছাঁটাইয়ের কারখানার শ্রমিকরা রাশি রাশি অভ্রের পাত নিয়ে কাটাছাঁটা করছিল—নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছতার প্রসার অনুযায়ী নানা আকারে ছেঁটে ফেলছিল।

কাটাছাঁটা অভ্রে বোঝাই হচ্ছিল ঝুড়ির পর ঝুড়ি। অভ্রের স্বচ্ছ চুনীরঙ থেকে ঠিকরে পড়ে বিদ্যুতের দ্যুতি। ঝুড়ি বোঝাই অভ্র নয়, যেন একরাশ বিদ্যুৎ। সঞ্জয় সামন্তর কারখানা ঘরের চাটাইয়ের বেড়ার নিষ্প্রভতা যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

অভ্রের বিদ্যুৎ ছটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিপাত করে সঞ্জয় সামন্ত বললেন, হিন্দু শাস্ত্রকাররা অভ্রকে যে পাথরে জমাট বাঁধা বিদ্যুৎ বলে বর্ণনা করেছেন, আমার

ধারণা তাতে কোন ভুল নেই—আপনাদের রসায়নশাস্ত্র বা ভূবিদ্যা যাই বলুক না কেন। অভ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণের সেই গল্পটি জানেন তো? বৃত্রাসুরকে সংহার করার জন্য ইন্দ্র যখন বজ্র হানলেন, তখন বিদ্যুতের ছটায় সমস্ত আকাশ উঠল ঝলসে। সেই বিদ্যুৎ আকাশ থেকে মাটিতে নেমে পাহাড়-পর্বতে শিখরে শিখরে সৃষ্টি করল অভ্রের স্তাল। হয়তো এ নিছকই কল্পনা, কিন্তু এই অভ্রের পাতগুলিকে দেখুন—দেখে কী মনে হয় না যে, এদের পরতে পরতে বিদ্যুৎ ধরা আছে। বিদ্যাপতি ভরা বাদরের পদে 'থির বিজুরির' কথা বলেছেন, তা যেন আকাশ ছেড়ে নেমে এসে অভ্রের পাতে বন্দী হয়েছে।

অভ্রের সৃষ্টিতত্ত্ব যে পেগমেটাইট পাথরের উৎপত্তির ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সঞ্জয় সামন্তকে তা বোঝাবার ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু বোঝাতে গিয়েই মনে হল যে, অভ্রের স্তরে স্তরে যে দ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছে, তা যেন তাকে বস্তুসীমা থেকে মুক্তি দিয়ে মিলিয়ে দিচ্ছে আকাশে মেঘের স্তরে স্তরে উদ্ভাসিত বিদ্যুৎলেখার সঙ্গে। ভূ-বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বকে মেনে নিতে তাই মন চায় না—বিজ্ঞানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পৌরাণিক কল্পকাহিনীকেই বিশ্বাস করতে ভাল লাগে।

॥ ২০ ॥

কয়লা

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে অনেক পরমাশ্চর্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চিন্তা এবং দার্শনিক চর্চার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতির নিদর্শন মেলে, আজকের দিনেও আমাদের কাছে তা' বিস্ময়কর ঠেকে। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ইতিহাসকে বিশ্লেষণ ক'রে বহু শতাব্দী ধ'রে ব্যাপ্ত যে ক্রমগুলির সন্ধান পাই, খ্রীষ্টের আবির্ভাবেরও বহু পূর্বে সেই ক্রমগুলি অতিক্রম ক'রে অধুনা-অনুশীলিত গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তানায়কদের বিচরণের প্রমাণ আছে। তখনকার ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে আজকের পরমাণু-তত্ত্বের কোন বিরোধ নেই। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর অতীতকে সমন্বয় করার তত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে আইনষ্টাইনের বস্তু ও বস্তু থেকে উদ্ভূত তেজঃপুঞ্জের মধ্যে ঐক্য নিরূপণের গাণিতিক সূত্র। আধুনিক পদার্থবিদ্দের মত ভারতীয় ঋষিদেরও

ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার অন্তর্দৃষ্টি—অর্থাৎ কিনা আপেক্ষিক তত্ত্বও অবিদিত ছিল না তাদের কাছে।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ছাড়া প্রাচীন ভারতে ফলিত বিজ্ঞানেরও চর্চা ছিল। ফলিত রসায়নের ক্ষেত্রে 'আকর' থেকে বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশন, মরচে-না-ধরা বিশেষ ধরনের ইস্পাত নির্মাণ, তা' ছাড়া নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন ইত্যাদির নিদর্শন ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। পুরা-কাহিনী ও কিংবদন্তী থেকে এদেশে যন্ত্রবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সম্বন্ধেও অনুমান করা চলে। আধুনিক কামান নাকি প্রাচীন শতঘ্নীর ছাঁচেই গড়া। প্রাচীন কাব্য ও কাহিনীতে উল্লিখিত বিমান নাকি শুধু কল্পনা নয়—প্রাচীন ভারতে প্রায় আধুনিক বিমানের মত বিমান নির্মাণ হ'ত ব'লে অনেকেরই বিশ্বাস। এ ছাড়া ছিল প্রায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সোনা, রূপা, তামা, হীরা, পান্না প্রভৃতির খনি, যাদের নিদর্শন ভূগর্ভে ও পাহাড়ে মধ্যে র'য়ে গেছে।

আমাদের নিষ্প্রভ বর্তমানকে ছাপিয়ে যায় গৌরবোজ্জ্বল অতীত। এতই উজ্জ্বল যে আমাদের কল্পনাকে পরিতৃপ্ত ক'রেও উদ্বৃত্ত থেকে যায়।

কিন্তু এতখানি গৌরবের আয়োজনের মধ্যে একটি ত্রুটি আমাদের চোখে ঠেকে। প্রাচীন ভারতীয়রা আমাদের নিত্যব্যবহার্য পাথুরে কয়লার ব্যবহার জানতেন না। কেবলমাত্র প্রাচীনকাল নয়, বিগত অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাথুরে কয়লার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভারতীয়রা সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন না। কয়লা বলতে তাঁরা বুঝতেন কাঠ-কয়লা। শতধৌতেও মুক্ত না হওয়া কালিমাযুক্ত অঙ্গার আহরণ করা হ'ত কাঠ পুড়িয়ে। মাটির নীচে বা পাহাড়ে বেলে বা কাদা-পাথরের সঙ্গে স্তরীভূত পাথুরে কয়লা মাঝে মাঝে হয়তো তাঁদের চোখে পড়েছে, কিন্তু খনন ক'রে তা' আহরণ করার কথা তাঁদের মনে হয় নি। সোনা, রূপা বা তামার খনি স্থাপনের দক্ষতা দিয়ে অনায়াসেই তাঁরা কয়লার খনি শুরু করতে পারতেন। অথচ তা' করেন নি।

এতে আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কথা। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে, উনবিংশতি শতাব্দীতে বাষ্পীয় যন্ত্রের ব্যবহার শুরু না হওয়া পর্যন্ত কয়লার কোন প্রয়োজন ছিল না ভারতীয়দের জীবনে। ভারতবর্ষের সর্বত্র ছিল বনসম্পদের প্রাচুর্য। এমন কি রাজস্থানের আধুনিক থর মরুভূমিও ছিল বনের সবুজে প্রচ্ছন্ন। কাজেই ইন্ধনের জন্য কাঠ বা কাঠ পুড়িয়ে তৈরি করা

কাঠ-কয়লাই যথেষ্ট ছিল। পাথুরে কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজনও অনুভব করত না কেউ। ধাতু নিষ্কাশনের জন্য আজকাল বিশেষ ধরনের পাথুরে কয়লা ব্যবহার করা হয়। প্রাচীনকালে ব্যবহার করা হ'ত ঘুঁটে ও কাঠ-কয়লা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে পাথুরে কয়লার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও রকম জ্ঞান ছিল কি না তার প্রমাণ নেই। বিহার ও মধ্যপ্রদেশের কয়লাক্ষেত্রে কয়লার স্তরগুলি যেখানে ভূপৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানে কোথাও কোথাও ব্যাপক অগ্নিদাহের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। দাবানলের প্রভাবে অতিমাত্রায় দাহ্য কয়লার স্তর-গুলিতে আগুন লেগেছিল। ক্রমে বনের আগুন নিবে যাওয়ার পরও কয়লার আগুন জ্বলতে থাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। এই আগুন থেকে স্থানীয় লোকেদের মনে কী রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'য়েছিল, তা' জানা নেই। স্থানীয় কিংবদন্তী বা লোককথার মধ্যেও তার কোন হদিস মেলে না। সম্ভবত এই আগুন তাদের কাছে অলৌকিক প্রাকৃতিক উপসর্গ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল।

কয়লাকে ব্যবহারিকভাবে চেনার পালা এল ব্রিটিশ আমলে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইংরেজরা কয়লার ব্যবহার জানতেন। এদেশে আসার পরই কয়লায় সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রানীগঞ্জ অঞ্চলে সীতারামপুরের অনতিদূরে সুমনার এবং হিটলির যুগ্ম প্রচেষ্টায় এবং তখনকার গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের আনুকূল্যে ভারতবর্ষের প্রথম কয়লার খনির পত্তন হয়েছিল। একই জায়গায় পাথুরে কয়লা দিয়ে 'আকর' থেকে লোহা নিষ্কাশনের আয়োজন করলেন মোটে ও ফারকুহার নামে দু'জন ইংরেজ। তাঁরাও হেষ্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী আনুকূল্যে ভাঁটা পড়ল এবং নবোদ্গত কয়লা ও লোহার শিল্প অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে মারকুইস অব্ হেষ্টিংসের নির্দেশে আবার কয়লা খনি পত্তনের প্রয়াস আরম্ভ করা হ'ল। তিনি রানীগঞ্জ কয়লা অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার আদেশ দিলেন। সমীক্ষা সাফল্যযুক্ত হ'লে রীতিমত কয়লা খননের কাজ শুরু করা হ'ল এখানে। কলকাতা থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নদীপথে কলকাতায় কয়লা নিয়ে আসা হ'ত। বর্ষাকালে বড় বড় নৌকায় কয়লা বোঝাই ক'রে অজয় নদী দিয়ে নিয়ে আসা হ'ত গঙ্গা নদীতে। তারপর গঙ্গার স্রোতের টানে এসে পৌঁছত কলকাতায়। বর্ষাকালে অজয় যখন প্লাবিত

হ’ত, কেবলমাত্র তখনই কয়লা-বোঝাই নৌকাগুলো ভাসানো যেত। শীত থেকে বর্ষার শুরু পর্যন্ত নির্জলা মাসগুলিতে খনির মুখে কয়লা জমিয়ে স্তূপীকৃত করা হ’ত। এ সময়ে খনির কাজও স্তিমিত হ’য়ে আসত। নদীপথে কয়লা নিয়ে আসা সব সময় সহজ হ’ত না। অজয়ের খরস্রোতে প্রতি বছরেই অনেকগুলো কয়লা-বোঝাই নৌকা জলে তলিয়ে যেত।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করা হ’ল রানীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র থেকে কয়লা আনার সুবিধার জন্য। এর পর কয়লার খনি অঞ্চলে কাজের তৎপরতা বেড়ে গেল। একে একে অনেকগুলো খনি পত্তন করা হ’ল রানীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা অঞ্চলে।

ইংরেজরা আমাদের কয়লার ব্যবহার শিখিয়েছে। রোমান সাম্রাজ্যের পদানত হওয়ার সময় ইংরেজরা সম্ভবত রোমানদের কাছ থেকে শিখেছিল ইন্ধন হিসেবে কয়লার ব্যবহার-যোগ্যতা। পৃথিবীর ইতিহাসে কয়লার প্রথম ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন গ্রীক্ লেখক থিয়োফ্রেস্টাস খ্রীষ্টের জন্মের ৩১৫ বৎসর আগে। তিনি লিখেছিলেন যে, ‘লিগুরিয়া’ এবং ‘এলিস’ অঞ্চলে কয়লা ব্যবহার করা হ’ত।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইংল্যাণ্ডে রীতিমত কয়লার ব্যবহার শুরু করা হ’ল। সমুদ্রের তীরে উদ্‌ভেদিত কয়লার স্তর থেকে সমুদ্রের জলে ধুয়ে আসা কয়লাই তখন ব্যবহৃত হ’ত। মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন কয়লার স্তর থেকে কয়লা খুঁড়ে বের করা শুরু হ’ল অনেক পরে।

১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় হেনরী টাইন নদীর তীরবর্তী নিউ কাস্‌ল্ অঞ্চলে সামুদ্রিক কয়লা আহরণের অনুমতি দিয়েছিলেন স্থানীয় অধিবাসীদের। কিন্তু ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম এডোয়ার্ড কয়লার ব্যবহার নিষিদ্ধ ক’রে দিলেন কয়লার ধোঁয়া তাঁর সহ্য হচ্ছিল না ব’লে।

কিন্তু তাঁর নিষেধ বেশি দিন কার্যকরী হ’ল না, কারণ কয়লার অপরিহার্যতা সম্পর্কে ক্রমশ অবহিত হচ্ছিল ইংরেজরা। কয়লার ব্যবহার তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারার সঙ্গে ক্রমশ অচ্ছেদ্যভাবে মিশে যাচ্ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ইংল্যাণ্ডে প্রায় প্রতিটি জনপদে চিমনি দেখা যেতে লাগল। চিমনি দিয়ে সর্বদা কালো ধোঁয়া উঠতে থাকল আকাশের স্বচ্ছ নীলিমাকে কলঙ্কিত ক’রে।

রানী প্রথম এলিজাবেথের আমলের একজন লেখক তাঁর জীবদ্দশায় যে সব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হ’য়েছে, তাদের কথা লিখতে গিয়ে সারা দেশ

চিমনিতে আচ্ছন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন বিশেষভাবে। তিনি লিখেছিলেন, যেদিকে তাকাই, চোখে পড়ে চিমনির সারি—আকাশকে ধোঁয়া দিয়ে কলুষিত করার বিশ্রী আয়োজন। কয়লার ধোঁয়ার প্রলেপে এ দেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিলুপ্ত হ'তে ব'সেছে।

এই লেখকের কয়লার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন রানী প্রথম এলিজাবেথ। যে বাড়িতে কয়লা ব্যবহার করা হ'ত, সেখানে তিনি ঢুকতেন না। কয়লা দিয়ে রান্না করা খাবার পর্যন্ত তিনি স্পর্শ করতেন না।

তাঁর কয়লার প্রতি বিরাগের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাঁর পারিষদ্ ও সভ্যসদ্বর্গও পাথুরে কয়লা ও কয়লার ব্যবহারকারীদের প্রতি নাক সিঁটকাতে শুরু করলেন। লণ্ডনে যখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসত, সমস্ত শহরে তখন কয়লা ব্যবহার নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন রানী এলিজাবেথ গ্রামাঞ্চল থেকে পার্লামেণ্টে যোগ দিতে আসা ভূস্বামীদের দামী সিল্ক ও সাটিনের পোশাক পাথুরে কয়লার কালো ধোঁয়ায় নষ্ট হয়ে যাবে ব'লে। তাঁদের জমিদারিতে জ্বালানী কাঠের অভাব ছিল না, কাজেই কয়লার ধোঁয়ায় লণ্ডনের আবহাওয়া যে দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে এ বিষয়ে রানীর সঙ্গে একমত হ'তে তাঁদের কোনও অসুবিধে ছিল না।

রানী প্রথম এলিজাবেধ কয়লা ও চিমনির ব্যবহারের ওপর ট্যাক্স বসিয়েছিলেন। অন্যান্য ট্যাক্সের তুলনায় কয়লার ট্যাক্সটি নাকি ওজনে ভারি ছিল। এই ট্যাক্সই নাকি ইংল্যাণ্ডের রাজস্বের মূল উৎস হ'য়ে উঠেছিল তখন। চিমনির ট্যাক্স আদায় করার ভার ছিল বিশেষ একদল ট্যাক্স-কালেক্টারদের ওপর। তাদের হাতে বিশেষ সরকারী ক্ষমতা আরোপিত হয়েছিল যে কোনও প্রকারে চিমনির ট্যাক্স আদায় করার জন্য। যে কোনও বাড়িতে যে কোনও সময়ে প্রবেশ করার অধিকার দেওয়া হ'য়েছিল তাদের। এমন, কি, যে কোনও লোকের শোবার ঘরে ঢুকতে পারত পাথুরে কয়লার চুল্লী জ্বালানো হয়েছে কি না তা' প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করার জন্য। সময়মত কয়লা বা চিমনির ট্যাক্স না দিলে নাকি বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করা হ'ত।

রানী এলিজাবেথের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাথুরে কয়লার ব্যবহারকারীরা দমে যায় নি। মানুষের সভ্যতায় কয়লা ক্রমশ তার যথাযোগ্য স্থান ক'রে নিল রাজরোষের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। কারণ রাজশক্তির সাধ্য ছিল না সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী গতিকে প্রতিহত করার।

ষ্টুয়ার্ট যুগের শেষে কয়লার অপরিহার্যতা স্বীকৃত হ'ল সরকারীভাবে। প্রত্যাহৃত হ'ল চিমনি ও কয়লা-কর।

এর পর থেকে ব্যাপকভাবে পাথুরে কয়লার উৎপাদন শুরু করা হ'ল ইংল্যাণ্ডের কয়লাক্ষেত্রে। অবাধ কয়লা খননের সঙ্গে লোহা নিষ্কাশনেরও বিপুল আয়োজন হ'ল। লোহার আকর থেকে ধাতব লোহা আহরণে কাঠ-কয়লার পরিবর্তে পাথুরে কয়লার প্রয়োগমাত্র লোহার উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে গেল। ইংল্যাণ্ডে ইস্পাতশিল্পের বনিয়াদ পাকা হ'ল।

শিল্পবিপ্লব ও যন্ত্রযুগের সূত্রপাতের মূল উৎস রয়েছে কয়লার মধ্যে। জেমস্ ওয়াট্ আবিষ্কার করেছিলেন জলীয় বাষ্পের অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তিকে, যা ইস্পাতের জড়তাকে মুক্তি দেয় দুর্বার গতিতে। জল বাষ্পে পরিণত হয় তাপের প্রেরণায়। বড় বড় যন্ত্রকে সচল করার জন্য প্রয়োজনীয় বাষ্প সৃষ্টি করতে যে বিপুল পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন, তা' সুলভে পাওয়া যেতে পারে একমাত্র পাথুরে কয়লা থেকেই।

জেমস্ ওয়াট্ কর্তৃক বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত সভ্যতার উদ্বোধন হ'ল ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। তারপর দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। উনবিংশতি শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতবর্ষেও শুনতে পাওয়া গেল এই নতুন যুগের পদধ্বনি।

পাথুরে কয়লাই এগিয়ে নিয়ে এসেছে এই নতুন যুগকে। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিকে বিভিন্ন ধাতু দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমান যুগকে বলা হয় লোহার যুগ। পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পারমাণবিক যুগের অভ্যুদয়ের কল্পনা করা হ'লেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে সভ্যতার বনিয়াদ এখনো লোহা ও ইস্পাতের মধ্যে গাঁথা রয়েছে। লোহার সঙ্গে কয়লার সম্পর্ক শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্কের মতই নিবিড়। কয়লার সাহায্য ছাড়া লোহাযুক্ত খনিজ থেকে ধাতব লোহা নিষ্কাশন সম্ভব নয়। কাজেই বর্তমান যুগকে লোহা ছাড়া কয়লা দিয়েও চিহ্নিত করা যায়।

নব-আবিষ্কৃত পারমাণবিক শক্তি কয়লা থেকে আহরিত শক্তিকে বহু গুণ অতিক্রম ক'রে গেলেও কয়লা তার যথাযোগ্য স্থান থেকে বিচ্যুত হ'তে পারে না। গঠনমূলকভাবে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ এখনো বৈজ্ঞানিক সন্ধানসাপেক্ষ। তা ছাড়া পারমাণবিক শক্তিকে সংহত ক'রে কয়লার পরিবর্তে ব্যবহার করাও সহজ নয়।

খনিজ তেলের সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষীতে কয়লার চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে এবং আরও বাড়বে। এদেশে আংশিকভাবে খনিজ তেলের স্থানও নিতে চলেছে কয়লা।

কয়লার চাহিদা যেমন বাড়ছে, তেম্নি খনিজ তেলের জন্য ব্যপক সমীক্ষা চলেছে আমাদের দেশে অজ্ঞাত খনিজ তেলের ভাণ্ডার আবিষ্কারের জন্য।

বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে সমুদ্র কুক্ষিগত তটরেখায় খনিজ তেলের জন্য সমীক্ষা চালাতে চালাতে ভূ-বিজ্ঞানীদের নজর কলকাতার তলার দিকেও পড়েছে।

॥ ২১ ॥

তরল সোনা

১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দ। কলকাতার আশেপাশে ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চলছিল। স্থানীয় লোকেরা তা দেখেও দেখেনি। কারণ ব্যাপারটাতে তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তখন মাটিতে কৃত্রিম কাঁপন সঞ্চার করে এবং বিমান চালিত চুম্বকযন্ত্রের সাহায্যে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তলাকার শিলাস্তরের স্বরূপ জানা গিয়েছিল। জানা গিয়েছিল প্রায় সাত আট হাজার ফুট পর্যন্ত মাটির স্তরের নীচে প্লায়োসিন যুগের বালি ও নরম কাদাপাথর ও বেলে-পাথরের স্তরের অস্তিত্ব। প্লায়োসিন যুগের শিলাস্তরের নীচে পর পর সাজনো আছে মায়োসিন, অলিগোসিন ও ইওসিন যুগের শিলাস্তর। এইসব শিলাস্তর উত্তর-পূর্ব দিকে আসামের ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত একটানা প্রসারিত। প্রসার একটানা হলেও অবিচ্ছিন্ন নয়। জায়গায় জায়গয় শিলাস্তরে ভাঁজ পড়েছে, তার মধ্যে চ্যুতিও ঘটেছে। মেদিনীপুর, কলকাতা, ঢাকা ও শ্রীহট্টের নীচে শিলাস্তরে ভাঁজ ও চ্যুতি আছে। কলকাতার নীচে চ্যুতির ফলে কলকাতার দক্ষিণ দিকের শিলাস্তরটি স্খলিত হয়ে তলিয়ে গেছে। তলিয়ে গিয়েও অবশ্য স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় নি। এখনো তারা অস্থির। অর্থাৎ আরও তলিয়ে যাবার তাল করছে।

কলকাতার নীচে এই চ্যুতি আপাতদৃষ্টিতে গুরুতর ত্রুটি হলেও এই চ্যুতির ফলেই জাতে উঠে গেছে কলকাতার নীচের শিলাস্তর। কারণ এই

চ্যুতির মধ্যে খনিজ তেল সঞ্চয়ের অনুকূল আধার সৃষ্টি হতে পারে। চ্যুতি ছাড়া শিলাস্তরের ভাঁজের খাঁজে খাঁজেও তেল জমা সম্ভব।

যে সম্ভাবনা ১৯৫৬-৫৭ সালে ভূবিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করেছিল তা সাম্প্রতিক সমীক্ষার ফলে সত্য হতে চলেছে। কলকাতার দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের অস্তিত্বর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তাতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন ভারতের ভূবিজ্ঞানীরা এবং তাঁরা অনুমান করছেন যে যমুনা, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা জুড়ে সঞ্চিত পলিমাটির অন্তরালে প্রায় সর্বত্রই খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁরা পলিমাটি প্রোথিত বহু জায়গায় খনিজ তেল সঞ্চয়ের অনুকূল শিলাগঠনের খোঁজ পেয়েছেন।

পলিমাটি প্রোথিত খনিজ তেলের ভাণ্ডারের নাগাল সর্বাগ্রে পাওয়া গিয়েছিল আসামের ডিগবয়ে। পরে ডিগবয়ের খনিজ তেলের ক্ষেত্রের বিপুল প্রসার প্রমাণিত হল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। ভূবিজ্ঞানীদের বিশ্বাস যে আসামের এই তেলের ভাণ্ডার পার্শ্ববর্তী নাগাল্যাণ্ড ও অরুণাচল প্রদেশেও বিস্তৃত হয়েছে। তাই সমীক্ষা চলেছে নাগাল্যাণ্ডে ও অরুণাচলে। অরুণাচলে সম্প্রতি খনিজ তেলের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। তেল না হোক গ্যাসের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল ত্রিপুরার মাটির নীচে—তাই সেখানেও ভূতাত্ত্বিক সন্ধান চলছে এবং গ্যাসের সঙ্গে তেলের চিহ্নের আভাস পাওয়া গিয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গার অববাহিকা জুড়ে বিরাজমান পলিমাটি যমুনা নদীর অববাহিকার মধ্য দিয়ে পশ্চিমে রাজস্থানের মরুভূমির সঙ্গে মিশেছে এবং তারপর দক্ষিণে মোড় নিয়ে ঢুকেছে গুজরাটের মধ্যে। রাজস্থানের বালুকাময় মাটির আড়ালে এ পর্যন্ত খনিজ তেলের কোন আভাস না পাওয়া গেলেও গুজরাটের মাটির নীচে বিপুল তেলের ভাণ্ডারের সন্ধান মিলেছে। পশ্চিমে গুজরাট এবং পূর্বে আসাম, পলিমাটির কুক্ষিগত অঞ্চলের দুই প্রান্তে খনিজ তেলের বিপুল ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়াতে মাঝখানকার বিভিন্ন এলাকাতে অনুসন্ধানের আয়োজন হয়েছে। অনুসন্ধান চলছে রাজস্থান, জম্মু, হিমাচল ও উত্তরপ্রদেশে—ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও ড্রিলিং দুই-ই চলছে এসব জায়গায়।

গুজরাটের মাটির নীচে খনিজ তেলে সম্পৃক্ত শিলাস্তরের গঠন ও প্রকৃতি পরীক্ষা করে ভূবিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন যে তা দক্ষিণে ও পশ্চিমে আরব

সাগরের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। তারপর চলল রীতিমত সমীক্ষা ও ড্রিলিং এবং খনিজ তেলের অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান মিলল বোম্বাইয়ের কাছাকাছি সমুদ্রের গর্ভে, যাকে আমরা 'বোম্বে হাই (Bombay high) বলে জানি। বোম্বে হাই-এর মত কচ্ছের উপকূলের কাছা-কাছি আরব সাগরের বুকে আর একটি তেলের ভাণ্ডারের সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার জন্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

আরব সাগরের মত বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী সাগর জলে ধোয়া পলি-মাটির আড়ালে খনিজ তেলের আধারের হদিস পাওয়া গিয়েছে। তেল ও গ্যাস কমিশনের বিজ্ঞানীরা পশ্চিম বঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর উপকূলে সমীক্ষা চালাচ্ছেন।

ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-যমুনার অববাহিকার পলিমাটির আড়ালে খনিজ তেলের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অনুরূপ একটি মৃত্তিকাপ্রোথিত বিপুল খনিজ তেলের ভাণ্ডারের কথা বলা যেতে পারে। সাহারা মরুভূমির বালির স্তরের নীচে যে খনিজ তেল থাকতে পারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ভূবিজ্ঞানীরা তা কল্পনাও করতে পারেন নি, কারণ বালির মধ্যে খনিজ তেলের কোন লক্ষণই তখন দেখা যায় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম পর্বে জর্মনির বিখ্যাত সেনাপতি জেনারেল রোমেলের সৈন্যবাহিনী সাহারা মরুক্ষেত্রে মিত্রপক্ষের বাহিনীর কাছে যুদ্ধ পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হয়। এই পরাজয়ের প্রধান কারণ জ্বালানী তেলের অভাব। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, রোমেল সাহারার মরুভূমির যে অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীর কাছে পরাজয় বরণ করেন, ঠিক সেখানেই বালির নীচে অপরিমেয় খনিজ তেলের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছিল দশ-পনেরো বছর বাদে। পরাজয় বরণের মুহূর্ত পর্যন্ত রোমেল কল্পনাও করেন নি, যে, যে জ্বালানী তেলের অভাব তাঁর পরাজয়কে অনিবার্য করে তুলেছে, আর অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁর পায়ের তলায় বালির নীচেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

সাহারা মরুভূমির মত উত্তর ভারতের পলিমাটি হয়তো অপরিমেয় তেলের ভাণ্ডারকে চাপা দিয়ে রেখেছে। এই সম্ভাবনা যে নিছক কল্পনামাত্র নয়, ভূ-বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

মূল্যমানের দিক থেকে না হলেও আজকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে খনিজ তেল সোনার চেয়েও মূল্যবান। তাকে তাই তরল সোনা বলা যেতে পারে।

উনবিংশতি শতাব্দীর গোল্ডরাশের মত বিশ্বময় পেট্রোলিয়াম রাশ শুরু হয়েছে। ১৮৪৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় উনপঞ্চাশীদের সোনার নেশার মত খনিজ তেলের নেশায় পেয়েছে পৃথিবীর মানুষদের। এই নেশা আমাদেরও নিত্য নতুন অনুসন্ধান ও সমীক্ষার প্রেরণা যোগাচ্ছে। এই নেশার ঘোরেই আমরা কল্পনা করতে শুরু করেছি যে যমুনা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা ও সমুদ্রতীরের পলি-মাটি তরল সোনার ওপরে ভাসমান। এই কল্পনা থেকে পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা থেকে দেশশুদ্ধ কর্মতৎপরতা দেখা যাচ্ছে। আমাদের আশা যে বর্তমান শতাব্দী শেষ হবার আগেই খনিজ তেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে আমাদের দেশ এবং তেলের উৎপাদনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইরান, লিবিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক ও কানাডার পাশাপাশি স্থান পাবে।

॥ ২২ ॥

জল ও বরাহমিহির

তরল সোনার ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেলে মানবসভ্যতা বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন হলেও বিকল্প শক্তির উৎসকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে যাবে। কিন্তু এমন একটি খনিজের কথা এখন বলব, যা নিঃশেষ হলে মানুষ নিশ্চিহ্ন হবে। মানুষের জীবন ধারণে তা বায়ুর মতই অপরিহার্য, তার বিকল্প কিছু নেই। খনিজটি হচ্ছে জল।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিকেরা জলের গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধান করছেন। জলরিক্ত মাটি বা পাথরের নীচে প্রচ্ছন্ন আছে জলসিক্ত শিলাস্তর। এখানে জল সর্বদা জমা থাকে। বাইরের থেকে যত জল মাটি শুষে নেয়, সব এখানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত হয়। জলবাহী এই শিলাস্তরকে জলের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলা চলে। বৃষ্টির জলে পুষ্ট এই স্তরটির প্রত্যক্ষ যোগ আছে সমুদ্র ও নদীতীরের সঙ্গে।

মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন 'পানির' দিকে কেবলমাত্র আধুনিক 'পানিওয়ালারাই' যে পানি প্রসারণ করেছেন, তা নয়, মাটির নীচে জলের আত্মগোপনের খবর

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে মানুষের গোচরে এসেছে। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রকৃতির গুপ্ত জলভাণ্ডার সন্ধানের প্রয়াস হয়েছিল। মাটির কত নীচে কোথায় কোথায় জল পাওয়া যেতে পারে—এ সম্পর্কে প্রাচীন দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও সমাজনীতিবিদ্‌রা রীতিমত গবেষণা চালিয়েছিলেন। জলের সন্ধানের জন্য রীতিমত জলশাস্ত্র বা জলবিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়েছিল প্রাচীন ভারতে।

জল সন্ধানের প্রচলিত পদ্ধতিগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন সারস্বত ও মনু। মনুর জলবিজ্ঞান মনুসংহিতার চেয়ে কম জোরালো নয়। সারস্বত ও মনুর জলবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনাগুলি বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার কয়েকটি শ্লোকের মধ্যে পুনর্বর্ণিত হয়েছে।

বৃহৎ সংহিতায় জলের সন্ধান পুণ্যকর্ম বলে অভিহিত। তাতে লেখা আছে যে, মানুষের দেহে রক্তস্রোত যেমন শিরা-উপশিরা বেয়ে প্রবহমান, জলের ধারাও তেমনি মাটির নীচে ধরিত্রীর বুকের শিরা-উপশিরার খাত বেয়ে বয়ে যাচ্ছে। মাটির নীচের জলের ভাণ্ডার খুঁজতে হলে এই সব শিরা-উপশিরাকে চিনে নিতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র ও শিব এই আটজন দেবতা বিরাজ করেছেন। ভূগর্ভের শিলাবদ্ধ জলবাহী শিরাগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করেছেন এই দেবতারা। শত সহস্র জলশিরার মাঝখানে রয়েছে মূল শিরা। এই মূল শিরাটি ভূগর্ভের জলের মূল আধার। জলের এই মূলাধার থেকে বিভিন্ন শিরা-উপশিরার মধ্যে জলের ধারা প্রবাহিত হয়।

মনু ও সারস্বতের রচনা থেকে চয়ন করে ভূগর্ভের জলশিরাগুলির স্বরূপ শ্লোকবদ্ধ করেছেন বরাহমিহির। তিনি লিখেছেন যে, দৃশ্যমান বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে অদৃশ্য অন্তঃপ্রকৃতির গোপন রহস্য প্রতিভাসিত।

মাটির নীচে গুপ্ত জলের সন্ধানে মাটির ওপরে ভূপ্রকৃতির মধ্যে কী কী দেখতে হবে তাদের বিস্তারিত বর্ণনা বৃহৎ সংহিতায় বিবৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথমে বিবেচ্য মাটির রং। তামাটে বা লালচে বাদামী রঙের মাটির নীচে জলের স্বাদ কটু। সাদা মাটির নীচে থাকে লোনা জল। সুমিষ্ট পানীয় জল থাকে নীলাভ মাটির স্তরের নীচে। যে মাটির রং সূর্য, আগুন, ছাই, উট বা গাধার মত, তার নীচে সাধারণত জল থাকে না। কিন্তু এই সব নির্জলা মাটির ওপরে যদি লাল ও দুধের মত সাদা রঙের বাঁশগাছের চারা গজায়, মাটির বন্ধ্যাত্ব ঘুচে গিয়ে তার মধ্যে জলের সঞ্চার ঘটে। যে মাটি বা পাথরের রং

পান্নার মত সবুজ, অথবা মেঘের মত ধূসর, তার মধ্যে জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তা ছাড়া যে মাটির রং মধু, ঘি, রেশমী কাপড়, পাকা ডুমুর, মৌমাছি বা পায়রার মত, তার নীচেও জলের অনিঃশেষ ভাণ্ডার বিরাজ করে।

ভূগর্ভের জলের আকর্ষণে গাছের ডাল মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। জলের টানে টলে পড়া গাছের ডালের পাতাগুলি অনেক সময় শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে। মাটির ওপরে গাছপালার সমাবেশ থেকে মাটির নীচে অন্তঃসলিলা জলের ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়। জায়গায় জায়গায় গাছের সঙ্গে উইঢিবির সহাবস্থান মাটির নীচে জলের স্তরের হদিস দেয়।

যেখানে জম্বুগাছ থাকে, সেখানে গাছের তিন হাত দক্ষিণে মাটির প্রায় দশ হাত নীচে জল পাওয়া যায়। নির্জলা মরুপ্রান্তরে ডুমুর গাছ থাকলে ডুমুর গাছটির তিন হাত পশ্চিমে প্রায় সাড়ে বারো হাত গভীরে সুমিষ্ট পানীয় জলের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে। অর্জ ন গাছের নীচে প্রায় সাড়ে সতের হাত গভীরে জলবাহী শিরার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। পাশাপাশি কুল ও পলাশগাছ থাকলে মাটির প্রায় সাড়ে ষোল হাত নীচে জল পাওয়া যেতে পারে। উইয়ের ঢিবি দিয়ে ঘেরা সপ্তপর্ণ গাছের প্রায় পঁচিশ হাত নীচে জল থাকে। দূর্বাঘাসে আবৃত উইঢিবির প্রায় পঁচিশ হাত নীচে জল পাওয়া যায়। নারকেল বা খেজুর গাছেরও বিশ-পঁচিশ হাত নীচে উত্তর-দক্ষিণবাহী জলশিরা থাকে।

ভূপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি—অর্থাৎ তিন হাতের মধ্যেই জল পাওয়া যেতে পারে—যদি কলা, পলাশ ও ডুমুর অথবা বট ও অশ্বত্থগাছ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে। নির্জলা মরু অঞ্চলে জল পেতে হলে মরুভূমির গাছপালার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। যদি মরুভূমির মধ্যে কোথাও বাঁশগাছ থাকে, তার পঞ্চাশ হাত নীচে জলের স্তর পাওয়া যেতে পারে। মরু অঞ্চলে কদমগাছ থাকলে তার একশ' পঁচিশ হাত নীচে জল পাওয়া যেতে পারে। শমী ও পলাশগাছ যেখানে পরস্পর জড়াজড়ি করে বেড়ে ওঠে, সেখানে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিনশ' হাত নীচে জলবাহী শিলাস্তর থাকতে পারে।

মাটির ওপরে যেমন গাছপালা, মাটির নীচে তেমনি সাপ, পোকামাকড়, গিরগিটি ইত্যাদি প্রাণী ভূগর্ভে নিহিত জলের ভাণ্ডারের হদিস দেয়। সারস্বত ও বরাহমিহিরের বিশ্বাস যে ভূগর্ভে জল থাকলে তার ওপরে মাটির স্তরের মধ্যে ব্যাং, সাপ, বিছে ইত্যাদি জীব প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে।

জল ছাড়া জীবন সম্ভব নয়। কাজেই যেখানে জীবনের চিহ্ন আছে, সেখানে মাটির নীচে জলের অস্তিত্ব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু প্রাণের কোন চিহ্ন না থাকলে মাটির নীচে যে জল থাকবে না তার কোন কথা নেই। নির্জীব বা নিস্তৃণ মরুভূমির নীচেও অন্তঃসলিলা জলের ধারা প্রবহমান হতে পারে। রিক্ততার বক্ষ ভেদ করে জলের সন্ধানের জন্য কয়েকটি কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন প্রাচীন ভারতের জলবিজ্ঞানীরা। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য হল মাটির স্তরে শব্দসঞ্চার। মাটিতে আঘাত হেনে তাতে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে তা কান পেতে শুনতেন প্রাচীন জলবিজ্ঞানীরা। এই আওয়াজের মধ্যে তাঁরা অতল জলের আহ্বান শুনতে পেতেন। শব্দ কাঁপা ও জোরালো হলো মাটির নীচে জলের নাগাল পেতে কুয়ো খুঁড়তে শুরু করতেন তাঁরা।

বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনে মাটি থেকে বাষ্পের উদ্‌গম হয়। প্রখর তপনের তাপ জলকে পলকে শুষে ফেলে এবং ফলে মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন জলের খানিকটা ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে আসে। কাজেই মাটির ওপরে বাষ্পের আভাস দেখে মাটির নীচে জলের সন্ধান চালাতেন প্রাচীন ভারতীয় জলবিজ্ঞানীরা।

ভারতের জলবিজ্ঞানীদের মতে মাটির স্তরের নীচে জলের অস্তিত্বের আর একটি পরোক্ষ প্রমাণ হল মাটির নমনীয়তা। মাটির নীচে জলের স্তরটি যদি ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে, ওপরকার মাটির স্তরটি মানুষের পদক্ষেপেই নুইয়ে পড়তে পারে।

প্রাচীন ভারতের জলবিজ্ঞান প্রাচীন ভারতবাসীদের বিজ্ঞানচিন্তার আভাস দেয়। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত না হলেও তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভূগর্ভে নিহিত জলের সন্ধানে প্রাচীন ভারতীয়দের প্রযত্ন আজকের জলসন্ধানীদেরও বিস্মিত করে।

॥ ২৩ ॥

বজ্রমানিক

প্রাচীন ভারতীয়রা চুনিকে বলতেন মানিক। মণিমাণিক্য বলতে প্রধানত চুনি ও অন্যান্য কম দামী রত্নজাতীয় পাথর বোঝাতেন। পরবর্তীকালে যখন তাঁরা হীরাকে চিনলেন, তার কঠোরতার জন্য তার নাম দিলেন 'বজ্রমানিক'।

বস্তুজগতে সব পদার্থের মধ্যে হীরে কঠিনতম। অথচ এই কঠিনতম বস্তুটিই পৃথিবীর মধ্যে উজ্জ্বলতম। চোখ ঝলসানো তার জৌলুস। স্বচ্ছতার বক্ষ ভেদ করে যেন আগুন ঠিকরে বের হয়। বিদ্যুৎ যেন তার মধ্যে বন্দী।

এমন নির্মল উজ্জ্বল কান্তি, কিন্তু উপাদান বিশুদ্ধ অঙ্গার। যে অঙ্গার গ্র্যাফাইট ও কয়লাকে কালো করেছে, সেই একই অঙ্গার হীরার অঙ্গকে করেছে সূর্যের মত দীপ্ত।

হীরা যেমন দীপ্তিমান, তেমনি দামী। পান্নাকে বাদ দিলে হীরার চেয়ে দামী কোন পাথরই নয়।

অথচ খনি থেকে কেটে বের করে আনা কাঁচা হীরা দেখে তার যে কোন দাম আছে তা মনে হয় না। কাঁচা হীরা একেবারে নিষ্প্রভ। তার তেলতেলে সাদা রঙ দেখলে তাকে সাধারণ পাথর ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। হীরাকে কাটলে পরেই তার ভেতরের উজ্জ্বলতা বিকর্ণ হয়।

হীরা কাটার কৌশল আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত হীরাকে হীরা বলে চেনে নি কেউ। সাধারণ পাথর বলে তা বহুকাল ধরে অবহেলিত হয়েছে। হীরাকে ঘিরে প্রাচীনকালের মানুষের কৌতূহল তেমন সজাগ হয়নি, কারণ নিষ্প্রভতার বর্ম ভেদ করে হীরার ভেতরের খবর নেওয়ার সাধ্য ছিল না তার। হীরা যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাদের কাছে তার কাঠিন্য প্রকট হয়েছে। তারা বুঝেছে যে হীরার চেয়ে কঠিন কিছুই নয় এবং হীরাকে কাটার মত কাঠিন্য কোন বস্তুই নেই। হীরাকে যে হীরা দিয়ে কাটা যায় তা আবিষ্কার করলেন জনৈক ভারতীয়। বাইরের নিষ্প্রভতার আবরণ অপসারণ করে তিনি অপাবৃত করেন আশ্চর্য উজ্জ্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে হীরক যুগের সূচনা হল। দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদীর তীরে আবিষ্কৃত

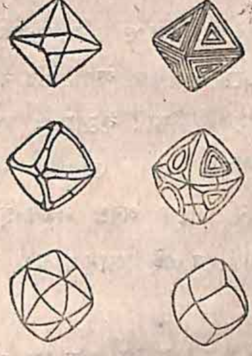
হল বিপুল হীরক ভাণ্ডার। এখানে যে খনি পত্তন হল তা গোলকুণ্ডার খনি বলে বিশ্বময় প্রসিদ্ধি লাভ করে। গোলকুণ্ডার খনিই পৃথিবীর প্রথম এবং বহু শত বছর ধরে একমাত্র হীরার খনি। তার আকর্ষণে বহু পর্যটক এসেছিলেন ভারতে। তাদের মধ্যে ছিলেন ফরাসী পর্যটক টাভার্নিয়ে। টাভার্নিয়ে এবং অন্যান্য পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হীরার জৌলুসে ঝলমল করত ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের কোষাগার। তাদের বৃত্তান্ত ছাড়া বিদেশী উপকথার মধ্যেও ভারতীয় হীরক ভাণ্ডারের বিস্ময়কর বিবরণ পাওয়া যায়। আরব্যোপন্যাসের বহু কাহিনীর মধ্যেও ভারতীয় হীরার উল্লেখ আছে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সি ভি রমন পুরানে বর্ণিত হীরার খনিগুলোকে একটি মানচিত্রে চিহ্নিত করে কৃষ্ণা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত হীরক ভাণ্ডারের একটি নকশা তৈরি করেছিলেন। এই নকশা দেখে আধুনিক ভূবিজ্ঞানীরা এই প্রাক্তন হীরক ভাণ্ডার পুনরুদ্ধারের প্রেরণা পেয়েছেন।

১৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডার খনিই ছিল পৃথিবীশুদ্ধ হীরার একমাত্র উৎস। তারপর ব্রাজিলে হীরার খনি প্রাবিষ্কৃত হল এবং বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল তার খ্যাতি। তারপর দেড়শো বছরের মধ্যে উন্মোচিত হল বোর্ণিও ও আফ্রিকার গহন অরণ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হীরক ভাণ্ডার।

সাম্প্রতিক কালের হীরার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ঘটেছিল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। এই বছরের গোড়াতে একদিন দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর তীরে অবস্থিত কেপটাউনের কাছাকাছি একটি গ্রামে বোয়ার চাস্প ড্যানিয়েল জ্যাকসনের ছেলেমেয়েরা নদীর ধারে খেলা করতে করতে একটি সাদা পাথর কুড়িয়ে পায়। পাথরটা জ্যাকসনের প্রতিবেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি শ্রীমতী জ্যাকসনের কাছে পাথরটা কিনতে চাইলে শ্রীমতী জ্যাকসন অমনিই দিয়ে দেন তাঁকে পাথরটি। সাদামাটা সাদা রঙের পাথরটি দেখে শ্রীমতী জ্যাকসনের সন্দেহমাত্রও হয়নি যে তার কোন দাম আছে।

.কিন্তু এই পাথটির পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তা খুবই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হীরা এবং তার দাম প্রায় আট হাজার টাকা। দেশশুদ্ধ সাড়া জাগার এই আবিষ্কার। হীরাটি যেখানে পাওয়া গিয়েছিল তার আশেপাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে আবিষ্কৃত হয় কিম্বার্লি ও অন্যান্য বিখ্যাত হীরার খনি। উনবিংশতি শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে হীরার উৎপাদনে দক্ষিণ আফ্রিকাই অগ্রগণ্য হয়ে উঠল। পরে আফ্রিকার অন্যান্য দেশের গুপ্ত হীরক ভাণ্ডার উন্মোচিত হতে

থাকে। দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা, আঙ্গোলা, জেয়ার (কঙ্গো), ঘানা, সিয়েরা লিয়োন প্রভৃতি দেশের গহন অরণ্যের মধ্যে বড় বড় হীরার খনি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে হীরার উৎপাদনে পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে জেয়ার (কঙ্গো)।



কেলাসিত হীরক খণ্ড

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রাজিলে হীরার খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর গোলকুণ্ডার খনি বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ঔরংজেবের আমলে মধ্য ভারতের ছতরপুরের রাজা ছত্রশাল পান্নাতে হীরার খনির সন্ধান পান। এই পান্না থেকে অল্প বিস্তর হীরা একটানা তিন শতাব্দী ধরে খনন করে উত্তোলন করা হয় এবং এখনো চালু আছে এখানকার খনি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে দাক্ষিণাত্যের হীরার খনিগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর পর বন্ধ হয়ে গেল কেন। এই সব খনি থেকে কোহিনুর, পিট্ট, অর্লফ, আকবর শাহ, পিগট, হোপ, জাহাঙ্গির ইত্যাদি নামধেয় বিশ্ববিখ্যাত হীরকখণ্ড বেরিয়েছিল। কাজেই এই সব খনির হীরক ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া বিস্ময়কর এবং অবিশ্বাস্য। গোলকুণ্ডার হীরার খনিগুলো বন্ধ হয়ে গেল কেন সে সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন হীরক বিশেষজ্ঞ শ্রীশম্ভুনাথ সেন। কৃষ্ণা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত গোলকুণ্ডার প্রাক্তন হীরক ক্ষেত্র এবং পান্নার হীরার খনিতে সমীক্ষা চালিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের খনিবিদদের নজর পাললিক শিলা ও নদী খাতের বালির মধ্যে নুড়ির আকারে প্রকীর্ণ হীরকখণ্ডগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হীরার মূল উৎসের দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়েনি।

হীরার মূল উৎস হল পাইপের আকারের আগ্নেয়শিলা, যা আগ্নেয়গিরি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লিতে এর আবিষ্কার বলে তার নাম দেওয়া হয়েছে কিম্বার্লাইট (Klmberlite)। কিম্বার্লাইটের অন্তর্নিহিত অঙ্গার ভূগর্ভের চাপ ও তাপের ক্রিয়ায় জমাট বেঁধেছে। পরে প্রাকৃতিক কারণে কিম্বার্লাইট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলে বাহিত হয়ে হীরা বালি ও নুড়ির সঙ্গে সঞ্চিত হয়েছে নদীর আধারে এবং বালি ও নুড়ি পাললিক শিলায় জমাট বাঁধাতে তার কঠিন আধারে বন্দী হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের খনিগুলো সবই এই পাললিক শিলানিহিত হীরক খণ্ডগুলোকেই উদ্ধার করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সব খনির হীরক ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়। তারপর বন্ধ হয়ে যায় খনিগুলো। খনিগুলো বন্ধ করে দেওয়ার আগে অবশ্য নতুন হীরক ভাণ্ডারের জন্য সন্ধান চালানো হয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয় এই সন্ধান পর্ব। কারণ মূল আগ্নেয়শিলার দিকে কারুর নজর পড়েনি।

শ্রীশম্ভুনাথ সেনের নেতৃত্বে যে সমীক্ষা শুরু হয়, তার ফলে কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন হীরার খনিগুলোর কাছাকাছি তিনটি পাইপের আকারের আগ্নেয়শিলা আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মধ্যে হীরার অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে। খোঁড়াখুঁড়ি করে তাদের মধ্য থেকে কয়েক খণ্ড হীরা উদ্ধার করা হয়েছে। শ্রীসেনের মতে সন্ধান চালিয়ে গেলে আরও হীরকযুক্ত আগ্নেয়শিলা পাওয়া যেতে পারে।

হীরার মূল উৎস যখন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, তখন দক্ষিণ ভারতে লোপ পাওয়া হীরক উৎপাদনের গৌরব পুনরুদ্ধারের আশাও হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। কোহিনুর, পিট, হোপ-এর মত হীরা হয়তো আবার পাওয়া যেতে পারে দাক্ষিণাত্যের খনি থেকে।

দাক্ষিণাত্যের মত মধ্য ভারতের পান্নাতেও এ পর্যন্ত পাললিক শিলা ও মাটির স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হীরার দিকে নজর পড়েছে খনিবিদ্‌দের। হীরকযুক্ত মূল আগ্নেয়শিলার দিকে নজর পড়েছে সাম্প্রতিককালে। মাঝগাঁওয়ার হীরকযুক্ত পাইপ-এর আকারের আগ্নেয়শিলা মাত্র কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আরও কয়েকটি হীরকযুক্ত মূল শিলার সন্ধান সম্প্রতি মিলেছে এখানে। মূল উৎসের খোঁজ যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন আশা করা যায় যে, হীরক উৎপাদনে ভারত আবার জগৎ-সভায় তার যথাযোগ্য স্থানটি ফিরে পাবে।

হীরক প্রসঙ্গ সমাপনের আগে আকাশের তারাকে 'like a diamond in the sky' বলে বর্ণিত বিখ্যাত ইংরেজী কবিতাটিকে স্মরণ করতে চাই। এই কবিতাটি প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে হীরার অস্তিত্ব সম্ভব কিনা।

অস্তিত্ব যে সম্ভব তার প্রমাণ রয়েছে উল্কাখণ্ডের মধ্যে। ভূপৃষ্ঠে পতিত কয়েকটি উল্কার মধ্যে সত্যিই হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে।

আকাশ থেকে হীরক প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেও হীরার জন্য মাটির দিকে নজর দিতে হবে আমাদের। মাটির সঙ্গে সমুদ্রের তলাতেও দৃষ্টিপাত করতে হবে, কারণ সমুদ্রের তলাতেও হীরকভাণ্ডারের সম্ভাবনা রয়েছে।

॥ ২৪ ॥

হীরার চেয়ে দামী

ভূতত্ত্ববিদ্‌দের বনেপাহাড়ে অভিযানের মধ্যে অভিসন্ধি যদি কিছু থাকে, সে হল অনুসন্ধানে, লুণ্ঠনের নয়। প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে তাঁদের খনিজ সম্পদ আহরণের প্রয়াসের মধ্যে অবৈধ কিছু নেই। কাজেই প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে ভূতত্ত্ববিদ্‌দের অবাধ বিচরণে বিরূপবোধ করা উচিত নয় কারুরই। কিন্তু সোনা বা রত্নখনির মধ্যে ভূতত্ত্বিকদের মূর্তিমান শনি বলে মনে করেন খনির মালিক। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত হলেও রত্নগর্ভা খনির মধ্যে ভূতাত্ত্বিককে দেখলে ভূত দেখার মত আঁৎকে ওঠেন খনির কর্তৃপক্ষ। তাঁরা সন্দেহ করেন পাথর সচেতন ভূতাত্ত্বিকরা বুঝি খনির যাবতীয় রত্নভাণ্ডার নিঃশেষে শুষে নেবে। কাজেই সোনা বা রত্নের খনিতে ভূতত্ত্ববিদ্‌দের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ চালান সহজ নয়।

এইচ ক্রুকশ্যাঙ্ক একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ভূতাত্ত্বিক। ভারতীয় ভূবিজ্ঞান সমীক্ষা বিভাগের তরফ থেকে এদেশে নানা যায়গায় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ চালিয়েছেন তিনি। সর্বত্র অবাধে বিচরণ করেছেন। কোথাও কোন অসুবিধে হয়নি তাঁর। কিন্তু বড়োরকম বাধা পেলেন তিনি সেবার রাজস্থানে কালিগুমানের

পান্নার খনিতে এসে। পান্না সম্পর্কে তাঁর ঝোঁকটা যে বিশুদ্ধরকম বৈজ্ঞানিক তা কেউ বিশ্বাস করেনি। সকলে জানে যে স্বচ্ছ সবুজ পান্না হীরার চেয়ে দামী। টাকা পয়সার হিসাব ছাড়া বিজ্ঞানের নিজস্ব নিরিখে যে তার মূল্যায়ন সম্ভব তা কারুর কল্পনাতেও আসে না। কাজেই কালিগুমান অঞ্চলে ক্রুকশ্যাঙ্ক সাহেবের শুভাগমনের মধ্যে পান্না-আসক্তি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না স্থানীয় লোকেরা।

অথচ কালিগুমান অঞ্চলে পান্নার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক রহস্যই ক্রুকশ্যাঙ্কের মনকে আকর্ষণ করেছিল। বায়োটাইট-সিষ্ট নামে পাথরের মধ্যে তার প্রচ্ছন্ন অবস্থানের ভূবৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজতে চেয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কালিগুমান অঞ্চলে অভ্র ও বেরিল নামক খনিজের খোঁজ করা হচ্ছিল। অভ্র ও বেরিলের জন্য সন্ধানপর্ব বায়োটাইট-সিষ্টের আবরণের আড়ালে পান্নার গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধান দিল অপ্রত্যাশিতভাবে। পান্না বেরিলের সমগোত্রীয় খনিজ। যেসব উপাদান বেরিলে আছে, তারা পান্নাতেও বিদ্যমান। অতিরিক্ত কেবলমাত্র ক্রোমিয়াম আছে পান্নাতে। এই ক্রোমিয়াম পান্নার আশ্চর্য সবুজ রং-এর কারণ। বেরিল ও পান্না উভয়েরই গড়ন হুবহু এক। তফাৎ শুধু রূপে। এমন অপরূপ পাথর প্রকৃতির রত্নভাণ্ডারে আর একটিও নেই। তার বিস্ময়কর জৌলুস, সবুজ রং ও স্বচ্ছতার মধ্যে প্রকৃতির কারুকৃতির চরম প্রকাশ। কিন্তু রূপে যত অপরূপ, মূল্যে যত অমূল্য হোক না কেন, বেরিলের মত পেগমেটাইট নামে শিলার শিরার মধ্যে সাদা কোয়ার্টজ ও ফেলস্পারের পাশেই পান্নার অবস্থান। কালিগুমানের বায়োটাইট-সিষ্টের মধ্যে পেগমেটাইটের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে বলে আন্দাজ করেন ক্রুকশ্যাঙ্ক।

ক্রুকশ্যাঙ্কের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মধ্যে কোনও ভেজাল না থাকলেও ভোজপুরী রক্ষীরা কালিগুমান খনির এলাকায় ক্রুকশ্যাঙ্ককে প্রথমে ঢুকতে দিতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু তাদের আপত্তিতে কর্ণপাত না করে যেমন দৃঢ় স্বরে তিনি খনির মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারকে ডেকে আনতে বললেন তাতে তারা তাঁকে রীতিমত আর্মির কর্ণেল বলে ঠাওরাল। রক্ষীদেরই একজন ভয়ে ভয়ে ক্রুকশ্যাঙ্ককে খনির মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের কাছে নিয়ে গেল। মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার ক্রুকশ্যাঙ্ককে চিনতেন। সসম্ভ্রমে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি খনির এলাকার মধ্য নিয়ে গেলেন।

খনি মানে খাদ। খাদটা অবশ্য বেশ বড় আকারের। তিনশ ফুট লম্বা ও ষাট ফুট গভীর। খাদের ভেতরে চারপাশে বায়োটাইটসিষ্টের মধ্যে সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টিপাত করে অবশেষে কয়েকটি পেগমেটাইটের টুকরো দেখতে পেলেন তিনি। দেখেই তিনি বুঝলেন যে বায়োটাইট-সিষ্টের ভেতরে প্রচ্ছন্ন পেগমেটাইটের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা থেকে আহরিত হয়েছে এই পেগমেটাইটের পিণ্ডগুলি। সঙ্গে সঙ্গে পেলেন তিনি পান্নার উৎসের হদিস। পেগমেটাইটের কয়েকটি নমুনা সংগ্রহ করে তার থলিতে ভরলেন ক্রুকশ্যাঙ্ক। তাঁর ইচ্ছা কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পর পেগমেটাইটের টুকরোগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন।

ঠিক এই সময় খনির মালিকের মুনিম ছুটে এল এবং পাথরের নমুনাগুলিকে ক্রুকশ্যাঙ্কের ঝুলি থেকে কেড়ে নিল জোর করে।

ক্রুকশ্যাঙ্কের সংগৃহীত পাথরের নমুনার মধ্যে পান্নার সবুজ রং-এর চিহ্নমাত্র না থাকলেও ক্রুকশ্যাঙ্ককে কালিগুমানের পেগমেটাইট বা বায়োটাইট-সিষ্টের একটি টুকরোও নিতে দেওয়া হল না। পাথরগুলিতে পান্না না পেলেও তাদের সূত্র ধরে পান্নার উল্লেখযোগ্য কোনও একটি গুপ্ত ভাণ্ডার ক্রুকশ্যাঙ্কের কাজের ফলে উদ্‌ঘাটিত হবে বলে আশঙ্কা করল খনির মালিকের মুনিম।

পৃথিবীর রত্নভাণ্ডারের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান বলে পান্না সম্পর্কে এত সতর্কতা। তার নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছতা, ঘন সবুজ রং-এর দ্যুতি ও দুর্লভতা তাকে এমন দুর্মূল্য করেছে। আকার, জৌলুস ও স্বচ্ছতার তারতম্য অনুযায়ী তার দাম প্রতি ক্যারট ছ হাজার থেকে ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পান্নার সবুজ রং-এর স্নিগ্ধতা আছে। গ্রীক দার্শনিক প্লিনি বিশ্বাস করতেন যে পান্নার সবুজ রং চোখের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও প্রখর করে। পীড়াদায়ক দৃশ্য দর্শনে চোখে ক্লান্তি এলে পান্নার দিকে তাকাবার বিধান দিয়েছেন তিনি। পান্নার পানে তাকালেই নাকি শ্রান্ত দৃষ্টি শান্ত হয়। পান্নার সবুজ রং-এ মোহিত হয়ে প্লিনি বলেছেন যে তার রং কখনই ম্লান হয় না। সূর্যের প্রখর আলো তার সবুজত্বকে এক বিন্দুও নিষ্প্রভ করতে পারে না।

পান্নার জৌলুস প্রাচীন মিশরের ফারাওদের চোখ ধাঁধিয়েছিল। মিশরে ক্লিওপেট্রার নিজস্ব একটা পান্নার খনি ছিল। পান্নায় মণ্ডিত রত্নালঙ্কার পরতে তিনি ভালবাসতেন। আলেকজাণ্ডারের আমলে মিশরের পান্নার খনিগুলি গ্রীকদের দখলে এসেছিল।

প্রায় পাঁচশ বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়াতে বড় বড় কয়েকটি পান্নার খনি ছিল। এই সব খনি থেকে ইউরোপে পান্না চালান দিত স্পেনিয়ার্ডরা। কলম্বিয়ার পান্নার বিশেষ সমাদর ছিল ইউরোপের দেশে দেশে।

শুধু যে একটি দুর্লভ ও দুর্মূল্য রত্ন বলেই পান্না সমাদৃত হত, তা নয়। তার বিশেষ কয়েকটি দ্রব্যগুণও প্রাচীন মিশর ও ইউরোপে স্বীকৃত হয়েছিল। প্রাচীন মিশরীয় ও ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করত যে পান্না ধারণ করলে সবরকম অসুখ সেরে যায়। বিশেষ করে তাদের মতে মৃগী ও আমাশার মত ব্যাধির প্রকোপ থেকে অব্যাহতি পেতে পান্না প্রায় অব্যর্থ। পান্না নিয়ে আরও অনেক বিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত। যেমন পান্না অনেক মৃত্যুশয্যাশায়ীর প্রাণ বাঁচিয়েছে। পান্নাধারিণী গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসবে কোন কষ্ট হয় না। পান্নার রং চোখের রোগও সারায়। তা ছাড়া পান্না যে ধারণ করে, তাকে ভূতে ধরতে পারে না। পান্না যেমন প্রাণ রক্ষা করে, তেমনি সতী নারীর সতীত্বও রক্ষা করে, ইত্যাদি।

পান্নার দ্রব্যগুণ সম্পর্কে প্রাচীন বা মধ্য যুগের বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি আজকের মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি পুরোপুরি। কাজেই পান্না তার স্বকীয় মূল্যমানের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মণি-মাণিক্যের মধ্যে শিরোমণি হয়ে আছে। অধুনা যেসব দেশে পান্না পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাশিয়ার উরাল, ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও মিশর।

ভারতে পান্না পাওয়া যায় রাজস্থানের মেবার ও আজমীর-মারওয়ার অঞ্চলে। আজমীর-মারওয়ারের বুবানি ও রাজগড় এবং মেবারের টেথি, গুমগুরহা ও কালিগুমানে পান্নার খনি আছে। খনিগুলি থেকে অবশ্য পান্নার উৎপাদন সামান্য পরিমাণই হয়ে থাকে।

ক্রুকশ্যাঙ্ক কালিগুমানের পান্নার খনি প্রসঙ্গে লিখেছেন যে যৎসামান্য পরিমাণে পাওয়া যায় বলেই পান্নার মূল্যমান বজায় থেকেছে। যদি ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফলে পান্নার নতুন নতুন ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়ে তার উৎপাদন বেড়ে যায়, তার মূল্য যাবে কমে—হীরার চয়ে দামী পাথরটির আর তেমন দামী থাকবে না।

॥ ২৫ ॥

তারামণির হার

উত্তর বর্মার মিনবুতে আমার বাল্যকাল কেটেছে। সেখানকার একটি তেলের খনিতে বাবা ভূতত্ত্ববিদের কাজ করতেন। খনিতে যে সব বর্মী কাজ করত, তাদের মধ্যে একজন বুড়োর সঙ্গে আমার ও আমার ভাইবোনদের খুব ভাব হয়েছিল। তার নাম ছিল উ-টিন। কাজের চেয়ে গল্পগুজবে তার মন ছিল বেশি। সুযোগ পেলেই আমাদের কাছে এসে সে নানা রকম গল্প করে শোনাত।

একদিন সে আমাদের বললে, আজ আমি তোমাদের এক সত্যিকারের রাজকন্যার গল্প শোনাব। আশ্চর্য সুন্দর তাঁর রূপ। ঠোঁট দুটি তাঁর চুনির চেয়েও লাল, চোখ দুটি নীলার মত নীল। তিনি একদিন আমার কাছে এসেছিলেন।

আমার ছোট বোন চোখ বড়ো বড়ো করে উ-টিনের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, সত্যিকারের রাজকন্যা সত্যি সত্যিই এসেছিলেন তোমার কাছে !

গম্ভীর মুখে উ-টিন বললে, এসেছিলেন বই কি। আমার কাছে না এলে পেতেন কোথায় সত্যিকারের খাঁটি চুনি ও নীলা দিয়ে গাঁথা মণিহার।

আমি প্রশ্ন করলাম, চুনি ও নীলার কারবার ছিল বুঝি তোমার ?

উ-টিন বললে, কারবার নয়, চুনির খনি ছিল একটা।

চুনির খনির মালিক ছিলে তুমি !—বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল আমার চোখ দুটি।

উ-টিন বললে, মালিক নয়, মালিকের চেয়েও বেশি ছিলাম। মোগকের নাম শুনেছ তো ? পৃথিবীর সেরা চুনির খনি আছে এখানে। এই চুনির খনির জহরি ছিলাম আমি। খনি থেকে যে সব চুনি খুঁড়ে বের করা হত, তাদের চিনে নিয়ে গুণ অনুযায়ী বাছাই করার দায়িত্ব ছিল আমার। খনির ম্যানেজার ছিলেন একজন খাঁটি বিলিতী সাহেব। খনির সর্বেসর্বা হলেও এক কুচি পাথরও তিনি আমাকে দিয়ে মঞ্জুর না করিয়ে বাজারে পাঠাতেন না। তিনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন, শোন উ-টিন, শান্‌ ষ্টেটের রাজার মেয়ে এসে খাঁটি

নীলা ও চুনির হারের ফরমাস দিয়েছেন। এই হারের জন্য পাথর তোমাকেই বেছে নিতে হবে।

খনির অফিসের পাশে ছিল একটা পাথরের ঘর। সেই পাথরের ঘরের দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা ছিল একটা প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক। সেই সিন্দুকের মধ্যে থরে থরে সাজানো ছিল নানান্ আকারের চুনি ও নীলা। পরিমাণে নীলার চেয়ে চুনিই বেশি। সুদূর প্রাচীন কাল থেকে মোগকের খনি থেকে চুনি ও নীলার উৎপাদন হয়েছে। উত্তর বর্মার ম্যাণ্ডালে থেকে প্রায় নব্বই মাইল উত্তর-পূর্বে চার হাজার ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় রয়েছে মোগকের খনি। এখানে চুনাপাথরের মধ্যে গাঁথা রয়েছে চুনি ও নীলা। আগে চুনির সঙ্গে সমান পরিমাণে পাওয়া গেলেও আজকাল নীলা প্রায় বিরল এসেছে। সিন্দুক ঘেঁটে মনের মত চুনি অনেকগুলো পেলাম, কিন্তু নীলা পেলাম না একটাও।

আমি বললাম, চুনি ও নীলা দুয়েরই তো উপাদান এ্যালুমিনা (alumina) বা এ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড্ (aluminium oxide)। তা হলে চুনির রঙ লাল ও নীলার রঙ নীল হল কী করে!

উ-টিন বললে, চুনির মধ্যে এ্যালুমিনার সঙ্গে ক্রোমিয়াম (chromium) মিশে আছে। ক্রোমিয়াম চুনিকে রক্তের মত টকটকে লাল করে তুলেছে। এই আশ্চর্য লাল রঙের জন্য প্রাচীন কালে ভারতীয়রা চুনিকে বিশেষ সমাদর করতেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন মাণিক্য। রক্তপদ্মের মত বলে তাকে পদ্মরাগও বলছেন তাঁরা। চুনিকে ইংরেজীতে বলে রুবি (ruby)। রুবি শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ruber থেকে। Ruber-এর অর্থ হল লাল। চুনির লাল রঙের উৎস যেমন ক্রোমিয়াম, তেমনি নীলার নিবিড় রঙের উৎস হল টাইটানিয়াম (titanium)। নীলাকে ইন্দ্রনীলও বলা হয়। নীলাকে ইংরেজীতে বলে স্যাফ্যায়ার (saphire)। স্যাফায়ার শব্দের অর্থ হল নীল আকাশের স্বচ্ছ উজ্জ্বল নীলিমা।

উ-টিন বলে চলে, সিন্দুকের মধ্য থেকে চুনি বেছে রেখে নীলা কী করে সংগ্রহ করব ভাবছি, এমন সময় শান ষ্টেটের রাজকুমারী নিজে এসে হাজির হলেন আমার কাছে। রাজকুমারীকে দেখে এমনি অবাক হলাম যে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। নীলার মত উজ্জ্বল নীল চোখ দুটি আমার মুখের ওপরে স্থাপন করে রাজকুমারী বললেন, খাঁটি চুনি ও নীলা হলেই চলবে না, তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে তারার ছয়টা করে রশ্মি ফুটে ওঠা চাই।

রাজকুমারীর কথা শুনে আমার চোখ দুটি কপালে উঠবার উপক্রম হল। আমি বললাম, তারামণি চান আপনি! কিন্তু সে তো আর মোগককে পাওয়া যাবে না। কবুতরের রক্তের মত লাল চুনি পাওয়া যাবে, খুঁজলে হয়তো নীলারও সন্ধান মিলবে, কিন্তু তারামণি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

আমার কথা শুনে তারামণির মতই জ্বলে উঠল রাজকুমারীর চোখ দুটি। তিনি বললেন, মোগককে পাওয়া সম্ভব না হলে অন্যত্র সন্ধান করুন। সাধারণ চুনি ও নীলাতে আমার চলবে না, তারামণিই চাই।

আমি তখন ম্যানেজারের কাছে গিয়ে রাজকুমারী যা বলেছেন সব বললাম তাঁকে। ম্যানেজার বললেন, রাজকুমারী যখন চান, তখন যাও তুমি শ্যামদেশে। সেখানে না যদি পাও, যাও সিংহলে ও কাশ্মীরে। খুঁজে বের কর তারামণি শ্রেণীর চুনি ও নীলা।

ম্যানেজারের নির্দেশমত প্রথমে গেলাম আমি শ্যামদেশে। সেখানকার চুনি ও নীলার খনি বন্ধ ছিল, কাজেই সন্ধান নিতে হল আমাকে রাজার রত্নভাণ্ডারে। শ্যামদেশের রাজার রত্ন ভাণ্ডারে নানা রকম মণিরত্ন মজুত ছিল, তাদের মধ্য থেকে অনেক কষ্টে কয়েকটি তারামণি শ্রেণীর চুনি খুঁজে পেলাম। কিন্তু নীলা পাওয়া গেল না। খুব চড়া দাম দিয়ে চুনিগুলি কিনে নিয়ে সিংহলে গেলাম নীলার সন্ধানে। সিংহলের দক্ষিণ-পশ্চিমে রতনপুর হল রত্নভাণ্ডার। এখানে জলবাহিত নুড়ি ও বালির স্তূপের মধ্যে নীলা ও আরও অনেক রকম রত্ন জমেছে। কিন্তু অনেক যত্ন করেও খুঁজে পেলাম না সেখানে রাজকুমারীর সাধের তারামণি শ্রেণীর নীলা।

শেষ পর্যন্ত গেলাম কাশ্মীর। শুনেছিলাম পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান নীলা কাশ্মীরেই পাওয়া গিয়েছিল। কাশ্মীরে নীলার খনি আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি মজাদার গল্প শুনেছি। সুদূর অতীতে একদল বণিক গান্ধার (আফগানিস্থান) থেকে ইন্দ্রপ্রস্থের (দিল্লী) দিকে যাচ্ছিলেন। পথে কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তাঁরা পাহাড়ের মধ্যে একটি খাদ দেখতে পেলেন। পাথর ধসে পড়ে সেই খাদের সৃষ্টি হয়েছে। খাদের গায়ে ঝলমল করছে নীল রঙের অনেকগুলো পাথর। এই নীল পাথর দেখে বিস্ময়ে নিথর হলেন যাত্রীরা। অনেকগুলো পাথর সংগ্রহ করে তাঁরা খচ্চরের পিঠে চাপালেন। তারপর তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে এই পাথরগুলোর বিনিময়ে তখনকার দিনে পরম মূল্যবান লবণ কিনলেন।

পাথরগুলো যে নীলা তা জানতে অবশ্য অনেক সময় লেগেছিল। কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে দুর্গম জানস্কর পর্বতের মধ্যে এই নীলার খনিতে অনেক কষ্টে গিয়ে পৌঁছালাম আমি। বিস্তর সন্ধানের পর খনি থেকে খুঁড়ে বের করলাম তারামণি শ্রেণীর কয়েকটি নীলা।

সংগ্রহ করা এই চুনি ও নীলা নিয়ে ফিরে এলাম আমি মোগকে। আমাদের কারিগর পাথরগুলি কেটে সুন্দর একটি হার বানিয়ে ফেলল। কবুতরের রক্তের মত লাল চুনি ও সমুদ্রের মত নীল নীলার মধ্যে ঝলমল করছে তারার রশ্মি। তারামণির হারটি নিয়ে আমি নিজে গেলাম রাজকুমারীর কাছে। রাজকুমারী হারটি পেয়ে খুব খুশী হলেন।

কিছুদিন বাদে খনির ম্যানেজার আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, দেখ উ-টিন, তোমার তারামণির হারটি পেয়ে রাজকুমারী খুশী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু রেঙ্গুনের একজন আমেরিকান রত্নব্যবসায়ীর কাছ থেকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরি একটি তারামণির হার পেয়ে তাক্ লেগে গেছে তাঁর। নকল তারামণির নাকি আসলের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর—অথচ দাম আসল তারামণির পাঁচ ভাগের এক ভাগেরও কম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে এ জাতীয় কৃত্রিম মনিরত্ন নাকি প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হচ্ছে। কৃত্রিম তারামণির হারটি নিয়ে রাজকুমারী আমাদের তৈরি করা হারটি ফেরৎ দিয়েছেন। হারটির জন্য তুমি অনেক মেহনত করছে, কাজেই ওটা আমি তোমাকেই উপহার দিচ্ছি।

এই পর্যন্ত বলে উ-টিন থামতেই আমি সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলাম, অমন দামী হারটা পেয়ে তো তোমার বড়লোক হয়ে যাওয়ার কথা, উ-টিন!

উ-টিন মৃদু হেসে বললে, যে মণিহার রাজকন্যার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, সে কি আমাকে সাজে! ম্যানেজারের কাছ থেকে হারটা পাওয়া মাত্র রাজকন্যার কাছে গিয়ে ওটা তাঁকে দিয়ে বললাম, এটা আপনাকে আমি উপহার হিসেবে দিচ্ছি—এর জন্য কোন দাম দিতে হবে না আপনাকে।

॥ ২৬ ॥

উপরত্ন

হীরে, চুনি, পান্না, নীলা প্রভৃতি দামী রত্নের চেয়ে কম দামী উপরত্নের সমাদর এমন কিছু কম নয়। একদা উপরত্নের জন্য সমীক্ষা করতে হয়েছিল আমাকে।

মুঙ্গের শহর থেকে কিছু দূরে কোয়ার্টজাইট পাথরের একটি পাহাড় আছে। পাহাড়টি একেবারে নেড়া, তার ওপরে গাছপালা কিছুই নেই। পাহাড়ের নীচে একটি মস্ত বড়ো বাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় যে বাড়িটা অন্ততপক্ষে দু তিনশো বছরের পুরোনো। তার পাথরের দেয়ালের ওপরে শ্যাওলার সবুজ ছোপ পড়েছে। খবর নিয়ে জানলাম যে বরিয়ারপুরের ভূতপূর্ব জমিদার রাঘবেন্দ্র সিং থাকেন ওখানে।

রাঘবেন্দ্র সিংয়ের বাড়ির কাছে ছিল বনবিভাগের একটি বিশ্রামগৃহ। সেখান থেকে কোয়ার্টজাইট পাথরের পাহাড়টির ওপরে স্ফটিক, জামীরা ও ওপালের সন্ধান করছিলাম। এই খনিজ তিনটিরই রত্ন হিসেবে সমাদর আছে, যদিও তাদের দাম তেমন কিছু বেশি নয়।

আসলে হীরা, পান্না, চুনি ও নীলাই হল রত্ন বা মণিদের মধ্যমণি। রত্ন হিসাবে সমাদৃত অন্যান্য খনিজ পদার্থ হল উপরত্ন। রত্নের তুলনায় সহজপ্রাপ্য ও সুলভ বলেই উপরত্ন বলে পরিচিত। কিন্তু সমাদর তাদের রত্নের মতোই।

বাইবেলের বুক অফ জেনেসিস এবং বুক অফ রেভেলেশনে অনেক উপরত্নের উল্লেখ আছে। ইহুদী সমাজের প্রধান পুরোহিতের বুকের বর্মে এইসব উপরত্ন ঝলমল করত।

উপরত্ন সংখ্যায় অনেক। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল পোখরাজ, গোমেদ, সৌগন্ধিক, তামড়ি, পীলু, চন্দ্রকান্ত, স্ফটিক, জামীরা, বৈদূর্যমণি, পেরিডট ও ওপাল। এদের মধ্যে স্ফটিক, জামীরা ও ওপালের উপকরণ হল সিলিকা। কোয়ার্টজাইট পাথরও সিলিকা দিয়ে গড়া। কাজেই পাথরের পাহাড়ের মধ্যে তাদের সন্ধান করছিলাম।

রোজই পাহাড়ের মাথায় উঠে মাপজোক ও খোঁড়াখুঁড়ি করি, সেই সঙ্গে খোঁজাখুঁজিও করি তন্ন তন্ন করে।

পাহাড়ের মাথায় কাজ করতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত পাহাড়ের নীচে রাঘবেন্দ্র সিংয়ের বাড়িটা। বাড়ির চারপাশে চমৎকার একটা বাগান ছিল—পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটি ঝর্নার জল বাগানটিকে সর্বদাই সতেজ ও সবুজ রাখত। চারপাশে অনুর্বর গাছপালাশূন্য ফাঁকা পাথুরে জমির মাঝখানে এই বাগানটিকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত—দেখে মনে হত যেন বিবর্ণ একটা তামার পাতের ওপরে চমৎকার একটা বৈদূর্যমণি বসানো রয়েছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় কাজ শেষ করে পাহাড় থেকে নেমে আমার আস্তানায় ফিরে এসেছি, এমন সময় আমার চাকর এসে খবর দিল যে রাঘবেন্দ্র সিংয়ের ছেলে ও মেয়ে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে!—আমি যেন আকাশ থেকে পড়ি। —তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছ বিদ্যাধর।

বিদ্যাধর গম্ভীর মুখে বললে, না স্যার, ভুল আমি শুনিনি! রাঘবেন্দ্র সিংয়ের ছেলে সুচিত সিং ও তার বোন সুচেতা আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চায়—রাঘবেন্দ্র সিং তাদের পঠিয়েছেন আপনার কাছে।

শশব্যস্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি বিশ্রামগৃহের বসার ঘরে চলে এলাম। বসার ঘরে লম্বা সোফার ওপরে পাশাপাশি বসেছিল সুচিত ও সুচেতা। তাদের দেখে অবাক হলাম। এমন আশ্চর্য স্বাস্থ্য ও রূপ কদাচিৎ চোখে পড়ে। দুজনেরই গায়ের রঙ ফর্সা, চোখ টানা টানা, মুখে আভিজাত্যের ছাপ আছে। সুচিতের বয়স বাইশ তেইশ হবে, সুচেতা বোধ হয় সতেরোও পেরোয় নি।

আমার সঙ্গে তোমাদের কী দরকার?—দুজনের মুখের পানে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর প্রশ্ন করি আমি।

সুচিত বললে, দরকার আমাদের নয়, আমাদের বাবার। তিনি জানতে চান সত্যিই কী আপনি ঐ পাহাড়ের মাথায় মণি-মাণিক্য শ্রেণীর পাথর খুঁজছেন?

সুচিতের কথা শোনামাত্র আমার রাগ হল খুব। কঠিন স্বরে আমি বললাম, তিনি জানতে চাইলেই যে আমাকে জানাতে হবে তার কী কথা আছে। কাজটা খুব গোপনে করছি আমি, যাতে তা কারুরই দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। তার জন্য সতর্ক হতে বলেছেন আমাকে আমার কর্তৃপক্ষ।

সুচিত মুচকি হেসে বললে, ভয় নেই, আমার বাবা আপনাকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক বলেই জানতে চান পাহাড়ের ওপরে কী খুঁজছেন আপনি! সত্যিই যদি মণিরত্নের সন্ধান করে থাকেন, আপনার সন্ধানপর্বে তিনি সহযোগিতা করবেন।

—সহযোগিতা করবেন মানে! তোমাদের বাবা এ জাতীয় পাথরের সন্ধান রাখেন নাকি?

—রাখেন বই কি। এ জাতীয় অনেক রকম পাথর তিনি এই পাহাড় ও পাহাড়ের আশেপাশে জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

রুদ্ধশ্বাসে আমি বললাম, কী কী পাথর সংগ্রহ করেছেন জানতে পারি কী?

নিশ্চই জানতে পারেন। —বলে পকেট থেকে একটি কাগজ বের করল সুচিত।

কাগজের ওপরে চোখ বুলিয়ে সুচিত বললে, কী কী পাথর সংগ্রহ করেছিলেন আমার বাবা তার সম্পূর্ণ তালিকা আছে এখানে। প্রথমতঃ পোখরাজ ও গোমেদ।

পোখরাজ ও গোমেদ পেয়েছেন তোমাদের বাবা!—উত্তেজনায় আমার গলার স্বর কেঁপে ওঠে।—জানো বোধ হয় যে প্রাচীন কালের মানুষেরা পোখরাজকে পাথরে জমাট বাঁধা আগুন বলে মনে করত! আর, গোমেদকে মনে করত হীরার সমগোত্রীয়! সিংহল, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, ব্রাজিল, রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায় পোখরাজ ও গোমেদ—এদেশে পাওয়া যায় বলে তো জানা ছিল না!

সুচিত বললে, পোখরাজ ও গোমেদ ছাড়া রক্ত রঙের সৌগন্ধিক ও তামড়ি পেয়েছিলেন আমার বাবা। তাছাড়া পেয়েছিলেন পীলু, চন্দ্রকান্ত ও বৈদূর্যমণি।

পীলু পেয়েছিলেন!—আমার চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।—পীলু বা জেড্ তো চীন ও বর্মা দেশের মানুষদের প্রিয় পাথর। চীন দেশের মানুষেরা বিশ্বাস করত যে জেডের মধ্যে সবরকম রত্নের সমাবেশ ঘটেছে এবং দয়া, বিনয়, সাহস, সুবিচার এবং জ্ঞান, এই পাঁচটি সদ্‌বৃত্তি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। চন্দ্রকান্ত মণির সমাদর করতেন হিন্দু মুনি-ঋষিরা। তাঁরা মনে করতেন যে চাঁদের কিরণে চন্দ্রকান্ত মণি থেকে জলক্ষরণ হয়। আর বৈদূর্যমণি এক আশ্চর্য পাথর। দেখতে বিড়ালের চোখের মত। কিন্তু এইসব পাথরও তো পাওয়া যায় না এদেশে। জেড ও চন্দ্রকান্ত মণি পাওয়া যায় যথাক্রমে বর্মা দেশ ও সিংহলে—বৈদূর্যমণি মেলে রাশিয়াতে।

স্থচিত গম্ভীর মুখে বললে, এদেশে আর কোথাও না পাওয়া গেলেও আমাদের এ অঞ্চলে খুঁজে পেয়েছিলেন বাবা। এইসব পাথর ছাড়াও পেয়েছিলেন তিনি স্ফটিক, জামীরা ও ওপাল।

ওগুলো তো আমিও খুঁজেছি।—সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলাম আমি।—জানলে স্থচিত, স্ফটিকের গ্রীক প্রতিশব্দের অর্থ হল বরফ। জলের মত স্বচ্ছ স্ফটিকের জৌলুস কম বলে তাকে নিষ্প্রাণ পাথর বলে অভিহিত করা হয়। স্ফটিককে হিন্দীতে বলে বিল্লৌর। বিল্লৌর থেকে বেলোয়ারী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। স্ফটিকে ম্যাঙ্গনিজ, টাইটেনিয়াম বা লোহার সংমিশ্রণ ঘটলে তার রং বেগুনী হয়ে ওঠে। বেগুনী রঙের স্ফটিককে বলে জামীরা বা অ্যামিথিষ্ট। গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে অ্যামিথিষ্ট ধারণ করলে ঘোরতর মদ্যপও মাতাল হয় না। অ্যামিথিষ্টের গ্রীক প্রতিশব্দের অর্থ হল—যে মাতাল হয় নি।

আর সবচেয়ে মজার পাথর হল, ওপাল।—আমি বলে চলি।—ওপাল ঈষৎ স্বচ্ছ অথবা অস্বচ্ছ হয়ে থাকে এবং তার ওপর থাকে নানা রঙের বর্ণালী। ওপালে মুক্তার মত জৌলুস আছে। লালচে হলদে রঙের স্বচ্ছ শ্রেণীর ওপালকে বলা হয় আগুনে ওপাল। প্রাচীন কালে হাঙ্গেরীতে ওপালের খনি ছিল। রোমানরা এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে ওপাল আহরণ করতেন। বড় আকারের ওপালের বিশেষ সমাদর আছে। নেপোলিয়ান বোনেপার্টের পত্নী সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের কাছে যে বড় আকারের ওপালটি ছিল, তাকে বলা হত জ্বলন্ত ট্রয়। তাতে আগুনের শিখার মত লাল রঙের নকশা আছে। ওপালের ওপরে জোসেফিনের পক্ষপাত থাকলেও য়ুরোপের সর্বত্র ওপালকে দুর্ভাগ্যদায়ী পাথর বলে মনে করা হত। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় আলফোন্সো ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি ওপাল পেয়েছিলেন। আংটিতে বসিয়ে এই ওপাল তিনি তাঁর রানীকে বিয়ের রাত্রে উপহার দিয়েছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই রানী মারা যান। তারপর ওপালটি রাজা তাঁর বোনকে দিলেন। তাঁর বোনও মারা যান কয়েক দিন বাদে। বোনের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধূকে ওপালটি উপহার দিলেন রাজা। ভ্রাতৃবধূ তিন মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। পর পর এতগুলো অঘটনের পর ওপালের আংটিটি আর কাউকে না দিয়ে নিজেই পরলেন রাজা। আংটি পরার পর আর বেশি দিন বাঁচেন নি তিনি। অবশেষে ওপালের আংটিটি মাদ্রিদের আলমুডেনা গির্জার ভার্জিন মেরীর

মূর্তিতে পরিয়ে দেওয়া হল। ভার্জিন মেরীর মূর্তিকে ওপালটি অর্পণের পর আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নি।

দম নেবার জন্য কিছুক্ষণ থেমে আমি আবার বলতে শুরু করি, হয়তো পর পর এই সব অঘটন ওপাল না পরলেও ঘটত। দুর্ঘটনাগুলির জন্য ওপালের ওপরে দোষারোপ হয়তো কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। ওপাল পরতে রানী ভিক্টোরিয়া ভালবাসতেন, কিন্তু তার জন্য কোন অঘটন তাঁর জীবনে ঘটে নি। যাদের অক্টোবর মাসে জন্ম, ওপাল তাদের কপাল ফিরিয়েছে বলে জানা যায়। বিশেষ কোনও পাথরের সঙ্গে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যকে জড়ানোর মূলে অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নেই।

আমার কথা শেষ হতেই সুচিত বললে, বাবা বলছিলেন যে এই সব পাথর ঐ পাহাড়ে এক সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও এখন পাওয়া যাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সন্দেহ আছে কেন?—ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে প্রশ্ন করি আমি। —পাথরের স্তরের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, হঠাৎ উবে যাবার কথা তো নয়!

—উবে যাওয়ার কথা তো বলছেন না বাবা, বলছেন ফুরিয়ে যাওয়ার কথা। আমার ঠাকুর্দা ও বাবা এই পাহাড় থেকে রকমারি পাথর খুঁড়ে বের করেছেন নিয়মিত। যে সব পাথরের কথা আপনাকে বলেছি, সবই প্রচুর পরিমাণে বের করে নিয়ে জমিয়েছেন তাঁরা। আমার বাবা পাঁচ বছর আগে পর্যন্তও এই পাহাড়ে খনন করে এই সব মণিরত্ন সংগ্রহ করেছেন। পাথরগুলি ক্রমশঃ ফুরিয়ে গেল, স্ফটিক ছাড়া আর সব কিছুই দুর্লভ হয়ে পড়ল। বাবা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে খনি বন্ধ করে দিলেন।

খনি বন্ধ করে দিলেন!—হতাশাব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলাম আমি।—তা হলে খোঁড়াখুঁড়ি ও খোঁজাখুঁজি করে কোন লাভ নেই!

—লাভ নেই বলেই মনে করেন বাবা। তিনি বলছিলেন যে বৃথা পাহাড়ের ওপরে ঘোরাঘুরি না করে আপনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। ঠাকুর্দা ও তিনি দুজনে মিলে যে সব পাথর ঐ পাহাড় থেকে খুঁড়ে বের করে সঞ্চয় করেছেন, সবই তিনি সঁপে দিতে চান আপনার হাতে।

নির্বাক বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ সুচিতের মুখের দিকে তাকিয়ে

থেকে আমি বললাম, সব আমার হাতে সঁপে দিতে চান ! তোমার বাবার মাথা খারাপ হয়েছে না কি !

গম্ভীর মুখে সুচিত বললে, মাথা খারাপ হবে কেন, রীতিমত সুস্থ মস্তিষ্কেই মণিরত্নগুলি সব আপনাকে দিয়ে দিতে চান তিনি। দয়া করে আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে—বাবা এ বিষয়ে আলাপ করবেন আপনার সঙ্গে।

সুচিত ও সুচেতার সঙ্গে ওদের বাড়িতে গিয়ে একেবারে ভেতরের মহলে ঢুকলাম। সেখানে প্রায় অন্ধকার ছোট ঘরের মধ্যে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন রাঘবেন্দ্র সিং। বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরে কোনও দুরারোগ্য রোগে ভুগে তাঁর এই অবস্থা হয়েছে।

আমাকে দেখে তাঁর শুকনো মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি।

আপনি এসেছেন, ভারি খুশি হয়েছি—ক্ষীণ স্বরে বললেন রাঘবেন্দ্র।—আমার ছেলে ও মেয়ের কাছে শুনলাম যে আপনি এই পাহাড়ে নানা রকম মণিরত্ন খুঁজছেন। আপনি যা খুঁজছেন তা আমার কাছে মজুত আছে, পাহাড়ে কিছুই অবশিষ্ট নেই এখন। পাথরগুলো সত্যিই যদি পেতে চান, পাহাড় ছেড়ে আমার ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

রাঘবেন্দ্রের মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, আপনার ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টি দেব ! আপনি কী আপনার জমানো পাথরগুলি আমাকে বেচে দিতে চান ?

—না বেচে দিতে চাই নে, চাই আপনাকে দিয়ে দিতে। জমিদারি গেছে, কিন্তু এই পাথরগুলোর জন্য বাড়ি ছেড়ে যেতে পারছি নে। সুচিত ভাগলপুরে কাপড়ের কারবার শুরু করেছে, সে চায় সুচেতাকে নিয়ে আমি তার কাছে গিয়ে থাকি। কিন্তু পাথরগুলোর একটা ব্যবস্থা না করে এখান থেকে নড়া অসম্ভব আমার পক্ষে। আমাদের পরিবারের সম্পদ হিসেবে পাথরগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করে এসেছি, কাজেই আমি বেঁচে থাকতে এগুলোকে বেচে দিতে পারব না। ভাগলপুরে নিয়ে যেতে সুচিত চায় না, কারণ তার ধারণা পাথরগুলো আমাদের কাছে থাকলে আমাদের দুর্ভাগ্যের সীমা থাকবে না।

আমি বললাম, পাথরগুলো অশুভ এরকম ধারণা সুচিতের হল কী করে ?

গম্ভীর মুখে রাঘবেন্দ্র বললেন, এরকম ধারণা সুচিতের হল কী করে বুঝতে

হলে আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা আপনাকে শুনতে হবে। পাথরগুলোর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ায় দায়িত্ব যদি নেন তো খুলে বলি সব।

—পাথরগুলোর ব্যবস্থা তো আপনিই করতে পারেন রাঘবেন্দ্রবাবু। সরকারী কোনও মিউজিয়মকে পাথরগুলো দিয়ে দিতে চান তো আপনি নিজেই লিখুন কলকাতা বা পাটনার মিউজিয়ামের কিউরেটারকে। তারপর মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ রাজী হলে সুচিত বা আর কারুর মারফত পাথরগুলোকে দিন পাঠিয়ে।

রাঘবেন্দ্র সিংয়ের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। মুখ নীচু করে তিনি বললেন, পাথরগুলোকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না মিষ্টার রায়—সেজন্যই তাদের কোনও ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার অনুরোধ, দয়া করে আপনি পাথরগুলোকে খুঁজে বের করে হয় সেগুলো নিজে গ্রহণ করুন, নয়তা কোনও মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিন।

ভুরু কুঁচকে রাঘবেন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি একটু ঝাঁজালো স্বরে বলে উঠলাম, পাথরের স্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা খনিজ পদার্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি বলে গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারব এমন ধারণা আপনার হল কী করে ?

আমার গলার স্বরের ঝাঁজ বা শ্লেষ বোধ হয় রাঘবেন্দ্রকে স্পর্শ করে না। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, শুনেছিলাম আপনার কাছে কিছু যন্ত্রপাতি আছে—তাদের সাহায্যে আপনি মাটির নীচে লুকোনো খনিজ পদার্থের সন্ধান পান। আমাদের পাথরগুলোকে আমরা খুঁজে না পেলেও তারা পুরোপুরি নিখোঁজ হয় নি। আমাদের বাড়ির চারপাশের বাগানের মধ্যেই কোথাও লুকোনো আছে পাথরগুলো। আপনার যন্ত্রপাতি দিয়ে সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারেন।

—আপনার বাগানের মধ্যে লুকোনো আছে! কে লুকিয়ে রাখল বলুন তো?

—লুকিয়ে রেখেছিল আমার ভাই। এবারে আমার ভাইয়ের ব্যাপারটা খুলে বলি আপনাকে।

ইতিমধ্যে সুচেতা কফি করে নিয়ে এসেছিল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে রাঘবেন্দ্র বলতে শুরু করলেন ঃ

আমার ভাইয়ের নাম বিজয়েন্দ্র। প্রায় দশ বছর আগে আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে সুচিত ও সুচেতাকে নিয়ে আমি বেনারসে গিয়েছিলাম। তখন

বিজয়েন্দ্র চাকর-বাকর ও গোমস্তা হরিকৃষ্ণ সহায়কে নিয়ে এখানে ছিল। পাথরগুলো যে সিন্দুকে রেখেছিলাম তার চাবিটা বেনারসে রওনা হওয়ার আগে বিজয়েন্দ্রকে দিয়ে এসেছিলাম আমি।

বিজয়েন্দ্র পাথরগুলিকে সিন্দুকের মধ্যে রাখতে ভরসা পায় নি। তার সন্দেহ ছিল যে চাকর-বাকর গোমস্তা সকলেই সিন্দুক ভেঙ্গে পাথরগুলোকে আত্মসাৎ করার সুযোগ খুঁজছে। ভয়ে রাত্রে সে ঘুমোতে পর্যন্ত পারত না।

শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল যে পাথরগুলোকে সিন্দুক থেকে সরিয়ে ফেলবে। একদিন গভীর রাত্রে বাড়ির সকলেই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে চুপি চুপি বাগানের মধ্যে শাবল দিয়ে বড় একটি গর্ত খুঁড়ল এবং সিন্দুক থেকে যাবতীয় পাথর বের করে একটি বাক্সে পুরে ফেলল। তারপর পাথরভরা বাক্সটিকে অনেক কষ্টে বাগানে নিয়ে গিয়ে গর্তের মধ্যে নামিয়ে মাটি ও পাথর চাপা দিল। বাগানের মধ্যে সবজি ও ফুলগাছ লাগাবার জন্য নানা জায়গায় মাটি কোপানো হচ্ছিল বলে বিজয়েন্দ্র কোথায় গর্ত খুঁড়ে পাথরভরা বাক্সটি পুঁতে রাখল তা বোঝার উপায় ছিল না। সিন্দুক থেকে সরিয়ে বাগানের মধ্যে পাথরগুলি লুকিয়ে রাখার পর বিজয়েন্দ্র একটি চিঠি লিখে খবরটা আমাকে জানাল। আমার ঠাকুর্দার আমলের একান্ত বিশ্বাসী একজন বরকন্দাজ চিঠিটা নিয়ে বেনারসে এসেছিল।

পাথরগুলো সিন্দুক থেকে সরিয়ে যে বাগানের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা গোমস্তা হরিকৃষ্ণ বা চাকর-বাকরদের কেউই টের পায় নি। তারা ধরে নেয় যে পাথরগুলো সিন্দুকের মধ্যেই রয়েছে। একদিন রাত্রে তারা শোবার ঘরে ঢুকে বিজয়েন্দ্রকে খুন করে সিন্দুকের চাবি হস্তগত করল। বলা বাহুল্য যে সিন্দুক খুলে তারা কিছুই পায় নি। বিজয়েন্দ্রকে তারা মেরে ফেলেছে, কাজেই পাথরগুলো কোথায় যে সে লুকিয়ে রেখেছে তা জানার উপায় রইল না তাদের। আমিও জানতে পারলাম না বাগানের মধ্যে ঠিক কোথায় সে পুঁতে রেখেছিল পাথরগুলোকে। বিজয়েন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বেনারস থেকে ফিরে এসে বাগানের মধ্যে অনেক খুঁজেও পাথরগুলোর কোন হদিস আমি পেলাম না। পাথরগুলোর জন্য বিজয়েন্দ্র খুন হয়েছিল বলে পাথরগুলোকে অশুভ বলে মনে করে সুচিত—আমার নিজেরও পাথরগুলোর প্রতি কোন আকর্ষণ বা আসক্তি নেই। পাথরগুলোকে অবশ্য খুঁজে বের করতে চাই আমরা, তাদের একটা সদগতি না করে আমরা শান্তি পাব না।

রাঘবেন্দ্রের কথা শেষ হতেই আমি বললাম, পাথরগুলো যে বাক্সের মধ্যে ভরেছিলেন বিজয়েন্দ্র, সেটা কিসের তৈরি বলতে পারেন ?

রাঘবেন্দ্র জবাব দিলেন, হ্যাঁ পারি ! বাক্সের বর্ণনা বিজয়েন্দ্রের চিঠিতেই ছিল। বাক্সটা ছিল মজবুত ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি—তার রঙ ছিল গাঢ় কালো।

ইস্পাতের বাক্স !—প্রদীপ্ত মুখে বলে উঠলাম আমি।—ইস্পাতের বাক্স যদি হয়, দু দিনের মধ্যেই পারব খুঁজে বের করতে।

রাঘবেন্দ্রের সঙ্গে আমার কথাবার্তা শেষ হতেই আমি আমার সাজ-সরঞ্জাম ও লোকজন নিয়ে রাঘবেন্দ্রের বাড়ির চারপাশের বাগানে জরিপ শুরু করলাম। সম্পূর্ণ বাগানটির একটা মানচিত্র তৈরি করে একশো ফুট অন্তর অন্তর খুঁটি পুঁতে ফেললাম। যেখানে যেখানে খুঁটি পোঁতা হল, সে জায়গাগুলিও চিহ্নিত করলাম মানচিত্রের মধ্যে।

তারপর একটা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে জমিটাকে পরীক্ষা করতে শুরু করলাম। প্রত্যেকটি খুঁটির পাশে যন্ত্রটি বসিয়ে যন্ত্রের কাঁটার নড়াচড়া লক্ষ্য করি। পর পর অনেকগুলো খুঁটির পাশে যন্ত্রটি রাখার পর বড় একটি কাঁটাঝোপের পাশে বিশেষ একটি জায়গা নির্বাচন করে সুচিতকে বললাম সেখানে মাটি খোঁড়ার ব্যবস্থা করতে।

সুচিত তৎক্ষণাৎ তাদের বাগানের মালিকে ডেকে সেখানে মাটি খুঁড়তে বলল।

হাত তিনেক মাটি খুঁড়তেই একটা মাঝারি আকারের বাক্স বেরিয়ে পড়ল। বাক্সটি নিয়ে আসা হল রাঘবেন্দ্র সিংয়ের ঘরে।

রাঘবেন্দ্র সিং নিজের হাতে খুললেন বাক্সের ডালা। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে পড়ল বাক্সের ভেতর থেকে। থরে থরে সাজানো মণিরত্নগুলির দিকে তাকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার।

পাথরগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে রাঘবেন্দ্রর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, পাথরগুলোর জৌলুস যেন তাঁর মুখে প্রতিফলিত হয়েছে।

তিনি বললেন, এই নিন্ পাথরগুলো, নিয়ে আমাকে অব্যাহতি দিন। মিউজিয়াম বা সরকারী দৌলতখানা, আপনার যেখানে খুশি দিন পাঠিয়ে।

আমি বললাম, মিউজিয়ামেই পাঠিয়ে দেব। একসঙ্গে এত রকমের দামী পাথর যে কোন ভাল মিউজিয়ামে রাখার যোগ্য।

সুচেতা বললে, আপনি কী করে বাক্সটা খুঁজে বের করলেন বলুন তো? বাগানের সর্বত্র যন্ত্রটা ঠেকিয়ে ঐ কাঁটাঝোপের নীচেই বাক্সটা আছে তা বুঝলেন কী করে?

আমি জবাব দিলাম, ঐ কাঁটাঝোপে যন্ত্রটি রাখতেই তার কাঁটা খুব জোরে নড়ে উঠল—তার থেকেই বুঝতে পারলাম যে বাক্সটা কাঁটাঝোপের নীচেই আছে। যন্ত্রটা হল ম্যাগনেটোমিটার। তাকে সচল করে দিলেই তার ভেতর থেকে চৌম্বকশক্তি বেরিয়ে মাটি ও পাথরের স্তর ভেদ করে মাটির অনেক নীচে চলে যায়। মাটির নীচে লোহা বা লোহাজাতীয় ধাতু থাকলেই তা তার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং যন্ত্রের কাঁটা বেগে নড়াচড়া করতে থাকে। কাঁটাঝোপের মাত্র তিন চার হাত নীচেই ছিল পাথরভরা এই ইস্পাতের বাক্সটা—ম্যাগনেটো-মিটারের চৌম্বক শক্তি যে তার দিকে আকৃষ্ট হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

এত সহজ ব্যাপারটা!—সোচ্ছ্বাসে প্রায় সমস্বরে বলে উঠল সুচিত ও সুচেতা।

মৃদু হেসে আমি বললাম, সহজ বই কি! যে কোনও কঠিন সমস্যার সমাধান সাধারণত সহজই হয়ে থাকে।

॥ ২৭ ॥

রবে না গোপনে

কঠিনতম সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে থাকে এটা অতি মূল্যবান কথা। এই কথাটির সত্যতা আমরা খনিজ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও যাচাই করতে পারি।

প্রকৃতি খনিজসম্পদকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখলেও তার অস্তিত্বের আভাস জেগে থাকে প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে। প্রত্যুষে উষার রক্তরাগ যেমন দিগন্তের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন সূর্যের আবির্ভাবের পূর্বাভাস ঘোষণা করে, তেমনি

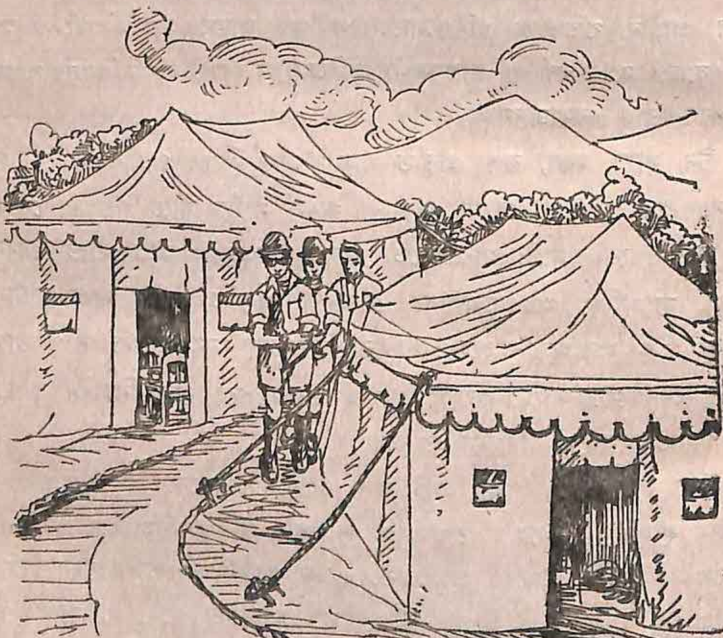
মাটির নীচে গুপ্ত সম্পদের আত্মঘোষণা চিহ্নিত হয়ে থাকে মাটি ও পাথরের স্তরে। সোনা ও মণিরত্নের মত দুর্লভ ধনও নদীনালার অববাহিকার বালির মধ্যে তাদের গোপন ভাণ্ডারের আভাস ফুটিয়ে তোলে। দেখার মত চোখ থাকলে মাটির ওপরে পরিস্ফুট চিহ্ন অনুসরণ করে প্রায় সব রকম খনিজের গুপ্তভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

এদেশে সোনা ও তামার খনির সন্ধান নিতে গিয়ে দেখেছি যে এদেশের প্রায় সব কটি সোনা ও তামার ক্ষেত্র প্রাচীনকালের, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় তিন-চার হাজার বছর আগেকার খনিবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অধুনা যে কয়টি তামা বা সোনার খনির পত্তন করা হয়েছে, তারা প্রাচীন খনিগুলোর পুনরুদ্ধার ছাড়া আর কিছু নয়। নতুন তামা বা সোনার খনির অনুসন্ধান করতে হলে প্রাচীন পরিত্যক্ত খনিগুলোকে পরীক্ষা করতে হবে। জনৈক স্বর্ণ বিশেষজ্ঞের মতে স্বর্ণ বা তাম্রসন্ধানী ভূবিজ্ঞানীদের প্রাচীন খনিবিদ্‌দের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই একমাত্র কাজ।

টিন, সীসা, দস্তা, রূপা প্রভৃতি ধাতু খুঁজতে গিয়েও প্রাচীন খননের চিহ্ন অনুসরণ করা হয়েছে। যে সব ধাতু বা খনিজ মাটির নীচে গুপ্ত না থেকে পাহাড়ের ওপরে বা মাটির আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করে আছে, যেমন লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, চুনাপাথর, শ্বেতপাথর প্রভৃতি, তাদের মধ্যে প্রাচীন খননের চিহ্ন সংরক্ষিত না হলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের খননকারীদের তৎপরতার প্রমাণ রয়ে গিয়েছে তাদের ব্যবহার করা হাতিয়ার এবং ধাতু নিষ্কাশন করার পর অবশিষ্ট "স্ল্যাগ্‌স্ (Slags)"-এর মধ্যে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে প্রাচীন বা মধ্যযুগের মানুষেরা এতখানি খনিজ-সচেতন হলেন কি করে। তথাকথিত ভূবিজ্ঞান বা খনিবিজ্ঞানের শিক্ষা না থাকলেও মাটি ও পাথরের স্তরের মধ্যে উহ্য প্রাকৃতিক সম্পদের হদিস তাঁরা পেলেন কী করে। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের জানা না থাকলেও এইটুকু বলা যেতে পারে যে সে কালের মানুষেরা এ কালের মানুষের তুলনায় মাটির অনেক বেশি কাছাকাছি ছিলেন এবং প্রকৃতিকে বোঝার ক্ষমতা ছিল তাঁদের সহজাত। যা আমরা ভূবিজ্ঞান বা খনিবিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝি, তা তাঁরা সোজাসুজি বুঝে নিতেন তাঁদের সহজাত প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান দিয়ে। আমাদের তুলনায় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ছিল তাঁদের দৃষ্টি—মাটি ও পাথরের মধ্যে

চিহ্নিত প্রকৃতির গুপ্ত সম্পদের স্বাক্ষর সহজেই ধরা পড়ত তাঁদের চোখে, যার দরুণ এদেশের এমন একটি সোনা বা তামার ভাণ্ডার নেই যা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়েছে। তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গী ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা রয়ে গিয়েছে এদেশের মাটির মানুষদের মধ্যে, তারা বহন করছে তাঁদের সহজাত প্রকৃতিজ্ঞানের ঐতিহ্য। মাটির কাছাকাছি থাকতে থাকতে মাটি ও পাথর সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অনেক সময় প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের হার মানায়। অথচ এরা সম্পূর্ণ নিরক্ষর এবং এদের অজ্ঞ ও মূর্খ বলে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এদের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভূবিজ্ঞানী, যদিও তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেবার মত উদারতা তাঁদের হয় নি।



ভূতাত্ত্বিকের শিবির

অধিকাংশ খনিজ মাটির ওপরে বা পাথরের গায়ে তাদের চিহ্ন রেখে গেলেও এমন কিছু কিছু খনিজ পদার্থ আছে (যেমন খনিজ তেল, মাটির গভীরে প্রচ্ছন্ন

কয়লা, জলসম্পদ প্রভৃতি) যাদের কোন স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় না প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে। এদের সন্ধান নিতে হলে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয়। ভারতের বহু গুপ্ত খনিজ তেলের ভাণ্ডার ভূ-পদার্থবিজ্ঞানসম্মত (geo-physical) পদ্ধতির সাহায্যে আবিষ্কার করা হয়েছে। গভীর ভূতলে নিহিত বহু ধাতুর সন্ধানেও এই সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করে যান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সহজাত অন্তর্দৃষ্টি থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপাত—প্রকৃতির বুকে উহ্য গুপ্ত সম্পদের সন্ধানে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক সব রকম কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। প্রকৃতির বুকে যা গোপন রয়েছে তা গোপন রবে না যদি আমরা প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে চিনে নিয়ে তার সঙ্গে হাত মেলাই। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড়তম ঘনিষ্ঠতা ঘটলে তবেই উদ্ঘাটিত হবে প্রকৃতির বুকে লুকানো সব কটি গুপ্ত সম্পদ—মিলন ঘটবে পাতালের আলোর সঙ্গে আকাশের আলোর।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

দশ টাকা